প্রথম অধ্যায়

দিব্যেন্দু পালিতের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের পটভূমি

ব্যক্তিজীবন ও ব্যক্তিমন এককভাবে সাহিত্যে তুলে ধরার অন্যতম ধারক হলো কথাসাহিত্য। মানবজীবনের বয়ে চলা ঘটনাপ্রবাহকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এই সাহিত্যশাখার দ্বারাই সম্ভব। তবে কালের প্রবাহে মানবজীবনের চলন, বলন, সংস্কৃতির পরিবর্তনের সাথে সাথে বদল হয়েছে এই সাহিত্যশাখার। কখনো বেশি গুরুত্ব পেয়েছে সমাজ, কখনোবা ব্যক্তি তার সীমাহীন মর্যাদা নিয়ে ধরা দিয়েছে। এরই মধ্যদিয়ে কথাসাহিত্যিকরা খুঁজে পেয়েছেন সাহিত্যসভায় তাঁদের স্বতন্ত্র আসন। স্বাধীনতা পরবর্তী ছয়ের দশকে এমনি একজন স্বতন্ত্র কথাসাহিত্যিক হলেন দিব্যেন্দু পালিত। যিনি ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা ও অন্তর্জগতের বিশ্লেষণী ভাবনার দ্বারা তাঁর সাহিত্যকর্মকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

দিব্যেন্দু পালিতের জন্ম শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণের স্মৃতিবিজড়িত বিহারের ভাগলপুরে বাংলা ২১ ফাল্গুন, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে (৫ মার্চ, ১৯৩৯ সালে)। তাঁর পিতা ছিলেন শ্রী বগলাচরণ পালিত এবং মাতা শ্রীমতী নীহারবালা পালিত। দিব্যেন্দু পালিতরা মোট এগারোজন ভাই বোন ছিলেন— কনকলতা, শুভেন্দু, নমিতা, অমিতা, দিব্যেন্দু, অনিতা, অমলেন্দু, কবিতা, অর্ধেন্দু, পূর্ণেন্দু, নবনীতা। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী কল্যাণী পালিত এবং একমাত্র সন্তান অমিতেন্দু পালিত।

দিব্যেন্দু পালিতদের আদি বাসস্থান ছিল বাঁকুড়া জেলার বেতড়ে। তারপর তাঁর পূর্বপুরুষরা ভাগলপুরে উঠে যান। সেখানে তাঁর বাবা খলিফাবাগ বা রাজেন্দ্রপ্রসাদ রোডের একটি ছাদওয়ালা পাকা বাড়িতে উঠে আসেন। ঐ বাড়িতে বেঙ্গলশেয়ার ডিলার্স সিণ্ডিকেট-এর অফিস ছিল, তাঁর বাবা ঐ সিণ্ডিকেটের ম্যানেজার ছিলেন। কিছুদিন পর অফিস উঠে যায়। তাঁরা ওখানেই থেকে যান। প্রথম দিকে সচ্ছলভাবে চললেও পরিবারের লোকজন বেশি থাকায় পরবর্তিতে অভাব-অনটন দেখা দেয়। বিশেষকরে যখন তাঁর বাবার ক্যান্সারে অকালপ্রয়াণ ঘটে ১৬ এপ্রিল, ১৯৫৮ সালে। তাঁর বাবার চিকিৎসা করেছিলেন ডাক্তার এবং সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)।

দিব্যেন্দু পালিতের যখন সাত-আট বছর বয়স, সে সময় ভারত স্বাধীন ও ভাগ হয়। সাময়িকভাবে দেশের বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। ভাগলপুরেও তার ছায়া পড়েছিল। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক কলহ লেগেই থাকতো। প্রায় প্রত্যেকদিনই সন্ধ্যার পর রাত একটু বাড়লেই চারিদিকে 'বন্দেমাতরম্' আর 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনি আকাশ ছেয়ে ফেলত। দিব্যেন্দু পালিতের কথায়—

> "সেই বয়সে দাঙ্গা যে কী, তা বুঝতাম না। কিন্তু সেটা যে ভালো কিছু নয়, তা বুঝতে পেরেছিলাম। আমরা যে-বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তার ছাদে উঠে দেখলাম দূরে দূরে লেলিহান আগুনের আভা ছেয়ে ফেলেছে আকাশ।"[১]

আমরা জানি, এই সময় দাঙ্গা ক্রমশ আরো ভয়ানক আকার ধারণ করেছিল।

এরপর দিব্যেন্দু পালিতরা ভাগলপুরেই গঙ্গার কাছে এক জমিদারের বাড়িতে স্থানান্তরিত হলেন। এই জমিদারের বাড়ির ডাকনাম ছিল 'বড়বাসা'। এর পূর্বে এই জমিদারী এস্টেটের (বড়বাসার) ম্যানেজার ছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই জায়গায় বসেই তিনি 'পথের পাঁচালী' রচনা করেছিলেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে এই অঞ্চলের অনেক বর্ণনা দিয়েছিলেন। দিব্যেন্দু পালিতরা বড়বাসায় থাকার সময়ও দাঙ্গা থামেনি। এই অঞ্চলটি হিন্দু অধ্যুষিত ছিল। পাশেই ছিল বুঢ়ানাথ মন্দির। ফলে স্থানীয় মুসলমানরা ঐ অঞ্চল ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

দিব্যেন্দু পালিত ছোটোবেলায় খুবই দুরন্ত ছিলেন। ভয় বলতে তাঁর কিছুই ছিল না, কৌতূহলও ছিল অদম্য। এই সময় বড়বাসায় হিন্দুরা বসতি স্থাপন করতে শুরু করলে এক বৃদ্ধ মুসলমান নিজের বাপ-মায়ের ভিটে ছেঁড়ে যেতে চায়নি। ফলে হিন্দুরা একরাতে তাকে হত্যা করে। তারপর মৃতদেহটি চটের বস্তায় বন্ধ করে ভোরের দিকে প্রকাশ্য রাস্তা দিয়ে নিয়ে যেতে থাকে গঙ্গায় ভাসাতে। বস্তার কোণা ধরে উল্লাস করতে করতে চারহত্যাকারী নিয়ে যাচ্ছে আর রক্ত ছিটকে ছিটকে পড়ছে রাস্তায়। খুব ছোটো বেলায় দিব্যেন্দু পালিত এরকম দৃশ্য দেখেন এবং সারাজীবন এই দৃশ্যটি তাঁর কাছে এক ভয়ানক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করেছে।

দিব্যেন্দু পালিত ভাগলপুরের এক প্রাথমিক স্কুলে পড়তেন। পরে স্থানীয় দুর্গাচরণ হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন ১৯৫৩ সালে। এই স্কুলে শরৎচন্দ্রও পড়েছিলেন। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই বই পড়ার প্রতি তাঁর প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। তিনি আত্মকথায় জানান—

> "ছোটবেলা থেকেই বেশ বই পড়ার ঝোঁক ছিল আমার, নির্বাচনে বাছ-বিচার ছিল না। ... কালানুক্রমিক রচনাপাঠের সুযোগ আমার কোনোদিনই হয়নি। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের বেশ কিছু বই পড়ে ওঠার আগেই আমি পড়েছি তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণের রচনা— এমনকি সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষের রচনাও। পড়েছি বইয়ের চেয়ে বেশি পত্রিকা। তখন কলকাতা থেকে ঢের দূর মফস্বলে যে দুটি সাহিত্যের কাগজ মূল্যবান ও সহজলভ্য ছিল, তাঁর একটি 'দেশ', অন্যটি 'আনন্দবাজার' পত্রিকার 'রবিবাসরীয়'। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, চতুরঙ্গ ইত্যাদি পত্রিকাগুলিও পাওয়া যেত কখনোসখনো।"[২]

স্কুলের শেষ দিকে দিব্যেন্দু পালিত এই পত্রিকাগুলির প্রতি বেশি আকর্ষিত হয়ে পড়েছিলেন। এছাড়াও স্কুলের হেডমাস্টারমশাই ম্যাট্রিকে ভালো রেজাল্ট করার জন্য তাঁদেরকে ইংরেজি বই পড়তে বাধ্য করতেন। ফলে ঐ সময়ে তাঁর ডিকেন্স, স্কট, জেন অস্টেন, মপাসাঁ প্রমুখের কিছু কিছু বাছাই করা বই পড়ার সুযোগ হয়েছিল। কলেজে ঢুকে বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকার গ্রাহক হন। স্থানীয় মাড়োয়ারি কলেজ থেকে বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে স্নাতক পাশ করেন এবং শেষে ১৯৬১ সালে বুদ্ধদেব বসুর সাহায্যে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুলনামূলক সাহিত্যে এম. এ. পাশ করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দিব্যেন্দু পালিতের শিক্ষাগুরুরা ছিলেন— বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, ড. ওয়েনার রেফিল্ড, ডেভিড ম্যাকাচ্চিয়ান, মাদার আঁতোয়ানি, ফাদার ফাঁলো প্রমুখ। যে কোনো সাহিত্য পড়ুয়ার পক্ষে একসঙ্গে এতোজন মনীষী শিক্ষকের সাহচর্য লাভ করা সত্যি ভাগ্যের ব্যাপার। এঁদের সান্নিধ্যে সাহিত্য বিষয়ে তাঁর বোধবুদ্ধি পরিচ্ছন্ন হয়। শুধু বাংলা সাহিত্যই নয়, এঁদের সংস্পর্শে এসে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গেও তাঁর ব্যাপক পরিচয় হয়।

দিব্যেন্দু পালিতের পিতা ১৬ এপ্রিল, ১৯৫৮ সালে হঠাৎ মারা গেলে তিনি চাকরির খোঁজে কলকাতায় আসেন ১ মে, ১৯৫৮ সালে। এতো বড়ো এবং অপরিচিত শহরে তাঁকে

প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। কলকাতায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠেছিলেন। সে'ই আত্মীয়ের খুব অসুবিধা হয়েছিল বলে দিব্যেন্দু পালিতকে মুখ ফুটে বলেছিলেন। এতে দিব্যেন্দু পালিতের খুব অভিমান হয়েছিল এবং তিনি কষ্ট পেয়েছিলেন। এরপর শিয়ালদহের কাছাকাছি হায়াৎলেনের বোর্ডিং হাউসে তাঁর এক ভাগলপুরের সহপাঠী থাকতো সেখানে যান। সেই বন্ধু ভাগলপুর থেকে এসে কলকাতায় একটা ব্যাঙ্কে চাকরি করতেন। সেই সহপাঠীও প্রতিদিন নয়, মাঝে মাঝে খেতে বলতেন। সময়টা ছিল ছয়ের দশকের শেষদিকে— ১৯৫৮-৫৯-৬০ সাল। শিয়ালদহ স্টেশনে তখনো উদ্বাস্তুরা গিজগিজ করেছিল। থাকার জায়গা নেই, খাবার জুটত না। এক বেলা খাবার জুটলেও, পরের বেলায় খিদের জ্বালায় ককিয়ে উঠতেন। এভাবে বেশ কয়েকদিন তিনি শিয়ালদহ স্টেশনের বেঞ্চিতে রাত কাটিয়েছিলেন। তিনি 'মর্মকথা'য় জানান—

> "তখন শিয়ালদহ স্টেশনে উদ্বাস্তুরা থাকতেন। একদিন রাতে আমাকে হাঁটুতে মুখ গুঁজে নিঃশব্দে কাঁদতে দেখে এক প্রৌঢ়া এসে হাত রাখলেন পিঠে। দেখি তাঁর হাতে একটি শালপাতায় দুটি রুটি আর কুড়নো তরকারির ঝোল। আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'খাও বাছা, দেখে বুঝতে পারি ভদ্দর ঘরের ছেলে। আহা রে বাছা। খেয়ে নে— ।' মানুষের এমন করুণার কণ্ঠস্বর আমি আরও শুনেছি। বেশ কিছুদিন পরে শেয়ালদা স্টেশনে ওই মহিলাকে খুঁজতে গিয়েছিলাম। পাই নি।"[৩]

দিব্যেন্দু পালিতের তখন আঠারো-উনিশ বছর বয়স। এইভাবেই কখনো জোড়াতালি দিয়ে কখনো সোজাসুজি যৌবনের শুরুটা তাঁর কেটেছে। দিব্যেন্দু পালিত তাঁর 'মর্মকথা'য় জানান, এমন জীবন যেন কারো না হয়। এক ধরনের আত্মবিশ্বাসই যৌবনের দুঃখময়, দারিদ্র্যের দিনগুলিতে টলতে দেয়নি তাঁকে। সাহিত্যচর্চা, বহির্জীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের নানা টানাপোড়েনের মধ্যেও তাঁকে অচঞ্চল রেখেছে। তাঁর সাহিত্যকে দিয়েছে অভিজ্ঞতা, বৈচিত্র্য, সাহস এবং চেনা থেকে অচেনায় নিরন্তর সন্ধানের পথ।

দিব্যেন্দু পালিতের প্রথম দিকের কর্মজীবনও সুখের ছিল না। জীবিকার জন্য শুরুতে তিনি গৃহস্থ বাড়িতে জ্বালানি ব্যবহারের সমীক্ষাকর্মীর কাজ করেছিলেন। লেখক তাঁর স্মৃতিকথায় জানান—

"প্রতিদিন সকালে ঠিকানা মিলিয়ে রেস্‌পন্ডেন্টদের বাড়ি যেতাম। তাঁরা কোন ধরনের জ্বালানি ব্যবহার করেন, কয়লা না কেরোসিন, নাকি গ্যাস, এটাই জানতে হত। কাজটা আমার খুব সুখের মনে হত না। কোনও কোনও রেস্‌পন্ডেন্ট মাঝেমধ্যে কটুকথা শোনাতেও ছাড়েননি। তবে কিছু ভালো লোকও দেখেছি। এইভাবে কলকাতায় আমি বেশকিছু মানুষের সংস্পর্শে এলাম। মানুষের সম্পর্কে মনের মধ্যে একটা ধারণা গড়ে উঠতে থাকল। এই পর্বে কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে আমায় লেখাও চালিয়ে যেতে হচ্ছিল।"[৪]

তারপর অডিট ফার্মের দিনমজুরির অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ পান। টাকার বড়ো অভাব ছিল তাঁর। পত্রিকায় লেখালিখির সুবাদে কিছু টাকা পেতেন। 'দেশ' পত্রিকা থেকে পেতেন কুড়ি টাকা আর 'আনন্দবাজার' পত্রিকা থেকে পনের টাকা। ১৯৫৯ সালের শেষ দিকে তিনি স্থির করেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হওয়ার টাকা জোগাড় করতে পারেননি। এই সময় নরেন্দ্রনাথ মিত্র, রমাপদ চৌধুরী, বিমল কর, সন্তোষকুমার ঘোষ— এঁদের সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। পরিচয় হয় বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে। তাঁকে দেখে এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলে মনস্থির করেন তিনি বুদ্ধদেব বসুর ছাত্র হবেন। বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় তিনি ভর্তির টাকা দেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তখন তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের প্রধান ছিলেন।

দিব্যেন্দু পালিতের প্রকৃত কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৬১ সালে অধুনালুপ্ত ইংরেজি দৈনিক 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার সাব-এডিটরের কাজে যোগদানের মধ্যদিয়ে। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তিনি এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সময় তিনি কল্যাণী পালিতকে বিয়ে করেন। বিয়ের সময় দিব্যেন্দু পালিতের চাকরি চলে যায়। তখনো ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। দিব্যেন্দু পালিতের তরফে বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তাদের এক পারিবারিক বন্ধু নন্দুদার বাড়িতে। এই নন্দুদাই দিব্যেন্দু পালিতকে একটি অ্যাড-এজেন্সিতে চাকরি জুটিয়ে দেন। কল্যাণী পালিত অবশ্য বিয়ের কয়েকমাস আগে সাউথ পয়েন্ট স্কুলে শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন।

এরপর ১৯৬৫ সালে দিব্যেন্দু পালিত যোগ দেন বিপণন ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত পেশায়। সেই সূত্রে দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন অ্যাডার্টস্‌ অ্যাডভার্টাইজিং এবং পরে দীর্ঘকাল যুক্ত

ছিলেন ক্লারিয়ন-ম্যাকান, আনন্দবাজার সংস্থা এবং 'দ্য স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার সঙ্গে। সেই সঙ্গে 'আজকাল', 'যুগান্তর', 'অমৃতবাজার' পত্রিকাতেও। লেখক বলেন—

> "বিজ্ঞাপন যে জীবিকা হতে পারে সেটা আমি প্রথম বুঝতে পারি ক্লারিয়ন-ম্যাকান অ্যাডভার্টাইজিং সার্ভিসেস-এ, সেখানে আমি ছিলাম প্রায় সাত বছর। আনন্দবাজার পত্রিকা তখন নতুন করে ব্যবসা প্রসারের কথা ভাবছে। আমাকে অরূপকুমার সরকার প্রস্তাব দিলেন তাঁদের নতুনভাবে গড়ে ওঠা বিজ্ঞাপন বিভাগে প্রধান হয়ে যোগ দিতে। আমাকে সেখানে আনন্দবাজারে বিজ্ঞাপন বিপণনের সর্বভারতীয় কর্মকাণ্ড দেখতে হত।"[৫]

১৯৮৭ সালে আবার ফিরে আসেন সাংবাদিকতায়— 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর রূপে। যুক্ত হন 'আনন্দবাজার' পত্রিকার 'রবিবাসরীয়' বিভাগ এবং সংস্কৃতি বিভাগের সম্পাদনার সঙ্গে। এরপর ২০০১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ২০০২ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত তিনি 'সংবাদ প্রতিদিন' পত্রিকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এই যে এতোগুলি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে লেখক লেখালিখির জগতে লাভবান হয়েছিলেন। কারণ এই জগতে যে অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছিলেন তা বাস্তবিক অভিনবরূপে সাহিত্যে প্রতিফলন ঘটান। চাকরির শেষ দিকে কিংবা অবসরের শুরুতেই দিব্যেন্দু পালিত সেরিব্রালে অচল হয়ে পড়েন। সেই থেকে আর স্বাভাবিক দিব্যেন্দু পালিতকে পাওয়া যায়নি। এই সময় তাঁর স্ত্রীও আকস্মিক মারা যান। ছেলেও চাকরির সূত্রে দূরে থাকতেন। ফলে দিব্যেন্দু পালিত একা হয়ে যান। এরপর তাঁর লেখালিখি স্তিমিত হয়ে আসে। তিনি ৩ জানুয়ারি, ২০১৯ সালে পরলোক গমন করেন।

ব্যক্তিজীবনে দিব্যেন্দু পালিত স্বাভাবিক, সৎ, কর্তব্যপরায়ণ ও হৃদয়বান এক মানুষ ছিলেন। স্নেহে ও সৌজন্যে অকৃপণ, অকপট; ব্যক্তিগত ও বহির্জীবনে অনেক আঘাত সহ্য করেও তিনি আড়াল করে রাখতেন নিজেকে। কারোর বিপদে সবসময় তিনি পাশে দাঁড়াতেন। খুব কঠোরকর্মাও ছিলেন। কাজ করতে ভালোবাসতেন। বন্ধুবর সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেছেন—

"সে সময় দেখেছি খুব মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে। আমি প্রায়ই বলতাম তুই লেখক, তুই শুধু লিখবি, এত দায়িত্ব নিয়ে মাথা ঘামাস কেন? এসব কাজে ঢিলে দিয়ে শুধু লেখা নিয়ে থাক। কিন্তু শোনেনি। যে দায়িত্ব নিয়েছে সেটা ঠিকমত পালন করতে না পারলে ওর স্বস্তি হত না। তাই লিখতও, আবার লেখার সাথে সাথে অফিসের কাজগুলিকেও সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে করার চেষ্টা করত।"[৬]

দিব্যেন্দু পালিত লেখার পরিশ্রমে কখনো ক্লান্তি বোধ করেননি। অন্য কোনো কাজ না থাকলে পাঠ্যবই থেকে কপি করে ভরিয়ে তুলতেন খাতার পাতা। সাহিত্য চর্চার গোড়ার দিকে ভালোমন্দ না ভেবে এভাবেই প্রয়োজনের তুলনায় বেশি লেখালিখি করেছিলেন।

দিব্যেন্দু পালিত খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর কথায়—

"দিব্যেন্দুর সবচেয়ে বড়ো গুণ হচ্ছে একদম বহির্মুখী নয়। খুবই ইন্ট্রোভার্ট।... তাছাড়া খুবই অনেস্ট। কখনও কোনো অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করতে দেখিনি। আর খুব পাংচুয়াল। যাকে যে সময় দেয় তার নড়চড় করে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট কাজটুকু করার চেষ্টা করে।"[৭]

সাহিত্যের মার্গে দিব্যেন্দু পালিতের প্রথম প্রবেশটি অনেকটা স্বেচ্ছায় আবার অনেকটা ভবিতব্যও বলা যায়। শৈশবে ভাগলপুরের দুর্গাচরণ হাইস্কুলে পড়াকালীনই তিনি ভাগলপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত একটি সর্বভারতীয় স্বহস্তে লিখিত গল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিলেন। ভাগলপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তখন খুবই সক্রিয় প্রতিষ্ঠান ছিল। ভাগলপুরে সাহিত্যচর্চার একটা সুন্দর পরিবেশ ছিল। বাংলার সংস্কৃতি থেকে দূরে থাকলেও বাঙালি সংস্কৃতি থেকে দূরে ছিল না ভাগলপুর। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীরা এখানে বসে সাহিত্য চর্চা করেছেন। দিব্যেন্দু পালিত তাঁর স্মৃতিকথায় জানান—

"এই ভাগলপুরেই সবচেয়ে বেশি জমিয়ে বসেছিলেন বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়—বনফুল।...এই সব নিয়ে সাহিত্যের যে পরিবেশ গড়ে উঠেছিল তা অল্পবয়সে আমাদেরও প্রভাবিত করে।"[৮]

ভাগলপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতি বছর বাংলা ভাষায় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ নিয়ে সর্বভারতীয় সাহিত্য প্রতিযোগিতার আহ্বান করতো। এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হতো কলকাতার 'আনন্দবাজার', 'যুগান্তর' প্রভৃতি পত্রিকায়। তখন লেখক স্কুলের শেষ ক্লাসে পড়তেন। তিনি হঠাৎ একদিন একটা গল্প পাঠিয়েছিলেন। প্রতিযোগিতাটির অন্যতম বিচারক ছিলেন বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)। আগে থেকেই বনফুলের সঙ্গে দিব্যেন্দু পালিতের পরিচয় থাকলেও বনফুল জানতেন না এই গল্পটি দিব্যেন্দু পালিতের লেখা। পুরস্কার প্রদানের দিন বনফুল জানতে পারেন গল্পটির লেখক দিব্যেন্দু পালিত। তারপর তিনি দিব্যেন্দু পালিতকে লেখা চালিয়ে যেতে বলেন। এই সময় পুরস্কার হিসেবে অনেকগুলি বই উপহার পেয়েছিলেন লেখক। একটি বইয়ে বৈষ্ণব সাহিত্যের সুপণ্ডিত ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখে দিয়েছিলেন—

"তোমার সাহিত্যপ্রীতি আমাকে করেছে মুগ্ধ ভাই।
সাধনায় সিদ্ধ হও, তোমারে আশিস দিয়া যাই।।"[৯]

দিব্যেন্দুর কথায়, "তখন থেকেই আমি পড়াশুনার চেয়ে লেখার দিকে বেশি মনোযোগ দিই।"[১০]

দিব্যেন্দু পালিতের বই পড়ার আগ্রহ হয়েছিল তাঁর মায়ের জন্য। তাঁর মা নিয়মিত গল্প-উপন্যাস পড়তেন। তিনি মর্মকথায় জানান—

> "ভাগলপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে আমি মায়ের জন্য বই আনতাম। মা খুব পড়তেন আর কি! আর সেই বইয়ের কিছুটা আমিও পড়ে ফেলতাম। সুযোগ পেলেই লুকিয়ে পাঠ্য বইয়ের আড়ালে রেখে পড়ে নিতাম। কোনও লেখা ভাল লাগলে বা কোনও একটা প্যারাগ্রাফ ভাল লাগলে, সেটা খাতায় টুকতাম এবং সেদিকে তাকিয়ে ভাবতাম যে আমি যদি কোনওদিন লেখক হই আমার পাণ্ডুলিপির চেহারাটাও এরকমই হবে। অক্ষরের প্রতি, শব্দের প্রতি একটা আগ্রহ, সেটা এইভাবে তৈরী হচ্ছিল।"[১১]

অর্থাৎ লেখক হওয়ার স্বপ্ন দিব্যেন্দু পালিতের কৈশোরেই তৈরী হয়েছিল। তিনি প্রায় একা একা সাহিত্যের নিভৃত চর্চা করতেন। তিনি বলেন, স্কুল থেকে কলেজে পড়বার সময়

সাহিত্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে অনেকটা পরিচয় হয় তাঁর। সেই সময় তিনি রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের লেখা কিছু কিছু পড়েন। বেশি করে পড়েন তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, সতীনাথ ভাদুড়ী, এমনকি বুদ্ধদেব বসুর লেখা। সেই সময়ই পড়েন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর, সমরেশ বসুর লেখাও। নিয়মিত পড়তেন 'দেশ', 'আনন্দবাজার' পত্রিকার 'রবিবাসরীয়', 'বসুমতী', 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী', 'পরিচয়', 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি পত্রিকাগুলি।

দিব্যেন্দু পালিতের পারিবারিক পরিবেশে লেখালিখির চর্চা ছিল না। তাঁর দাদা অল্পবিস্তর লিখতেন। কিন্তু চর্চার অভাবে লেখা ছেড়ে দেন। লেখক জানান, "আমার লেখালিখির ব্যাপারটা আমার বাবা, মা, দাদা সকলেই লক্ষ করেছিলেন। তাঁরা সাহিত্য ভাবনায় ভাবিত না হলেও আমাকে উৎসাহ দিতেন।"[১২] এই সময় দিব্যেন্দু পালিত আর তাঁর বন্ধুরা ভাগলপুরে 'প্রগতি সংঘ' নামে একটি সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে সহপাঠী বন্ধুরা মিলে নিজেদের লেখা পড়তেন এবং সাহিত্যচর্চা করতেন।

স্কুলে পড়ার সময় বিভিন্ন প্রতিযোগিতা উপলক্ষে দু'একটি গদ্য লিখেছিলেন তিনি। সেগুলির সবই বিষয়-নির্ভর হালকা রচনা। দু-একটি পুরস্কারও পেয়েছিলেন। পাটনার কোনো এক সংস্থা দ্বারা আয়োজিত স্কুলের ছাত্রদের জন্য এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় তিনি দ্বিতীয় হয়েছিলেন। কাগজে এই প্রথম তাঁর নাম ছাপা হয়। তাঁর এই সাফল্যে মাস্টারমশাইরা ক্ষুদ্র কৃতিত্বেও অসামান্য গর্ব বোধ করেছিলেন। দিব্যেন্দু পালিত বলেন—

> "প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষে এঁদের উৎসাহ শৈশবেই আমাকে বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগী করে তুলেছিল।"[১৩]

দিব্যেন্দু পালিতের পাকাপাকিভাবে লেখালিখির জগতে প্রবেশ ১৯৫৫ সালে। তখনো তাঁর বয়স ষোলো বছর অতিক্রম হয়নি। তিনি ভাগলপুর কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। সহপাঠী বন্ধু রণজিৎ মিত্রকে একটা গল্প পড়িয়ে শুনিয়েছিলেন তিনি। রণজিৎ বলেছিলেন, গল্পটা আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়তে পাঠাতে। রণজিতের পরামর্শেই দিব্যেন্দু পালিত প্রথম গল্প 'ছন্দপতন' আনন্দবাজারের রবিবাসরীয়তে পাঠিয়েছিলেন। এর এক-দেড় মাসের মধ্যে তা প্রকাশিত হয় (১৯৫৫ সালের ৩০ জানুয়ারি 'আনন্দবাজার' পত্রিকার

‘রবিবাসরীয়’তে)। এটিই দিব্যেন্দু পালিতের প্রথম লেখা। তারপরের বছরেই ‘দেশ’ পত্রিকার সম্পাদকীয় দফতরে দিব্যেন্দু পালিত আর একটি গল্প পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু গল্পটি ফেরত আসে। তখন ‘দেশ’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বিমল কর। তিনি গল্পটির পাণ্ডুলিপি কিছুটা সংশোধন করে দিব্যেন্দু পালিতকে পাঠিয়ে দিয়ে চিঠিতে জানান— “গল্পটি পরিমার্জনা করে পাঠান, নতুবা নতুন গল্প পাঠান। আপনার আশা নিশ্চয়ই পূরণ হবে।”[১৪] দিব্যেন্দু পালিত নতুন গল্প পাঠাননি। পুরনো গল্পটাই ঘষামাজা করে পাঠিয়েছিলেন। এর মাস খানেকের মধ্যেই গল্পটি ছাপা হয়। গল্পটির নাম ‘নিয়ম’। গল্পটি ১৯৫৬ সালে সাপ্তাহিক ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই সময়েই ১৯৫৫-১৯৫৬ সালে দিব্যেন্দু পালিতের প্রথম কবিতা ‘তোমার ভালোবাসা’ ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ দিব্যেন্দু পালিত ছোটোগল্প এবং কবিতা একই সময়ে লেখা শুরু করেছিলেন। তবে দিব্যেন্দু পালিতের কিছু কিছু গল্প স্নাতকোত্তর হওয়ার আগেই প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়— এগুলির সবই তিনি ভাগলপুর থেকে ডাকে পাঠিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় সেগুলির খোঁজ পাওয়া যায়নি। দিব্যেন্দু পালিত তাঁর প্রথম দিকের গল্পগুলি সম্পর্কে বলেছিলেন—

> “লেখার জন্য অনেক লড়াই করতে হয়েছে। ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে অপেক্ষাও করতে হয়েছে। আমার প্রথম মুদ্রিত গল্প পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গে ছাপা হল এবং আনন্দবাজারের মত কাগজে এবং পরের বছর দেশের মত পত্রিকায়, এতে যেন কেউ না মনে করেন যে আমি যা পাঠিয়েছি তাই ছাপা হয়েছে। তা কিন্তু হয়নি। আমার বেশ কিছু গল্প অমনোনীত হয়ে ফেরত এসেছে যে কোনও কারণেই হোক। আমি ধরেই নিতাম যে গল্প পছন্দ হবে না, প্রত্যাখ্যাত হবে; আবার কোনও কোনও গল্প ছাপা হতেও পারে। এটুকু বুঝতাম যে ছাপা হচ্ছে যখন, তখন আমি বোধহয় লিখতে পারি এবং আমার লেখার ওপর এঁদের একটা— মানে যাঁরা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন না, তাঁদেরও আস্থা আসছে।”[১৫]

১৯৫৮ সালে মে মাসে কলকাতায় পাকাপাকিভাবে আসার পর আরো নিয়মিত হয় দিব্যেন্দু পালিতের লেখা। ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গল্প-সঙ্কলন গ্রন্থ ‘শীত-গ্রীষ্মের স্মৃতি’। তখন তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের ছাত্র। এছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থগুলি হলো— ‘মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ’ (১৯৭৩), ‘মূকাভিনয়’ (১৯৮২)

‘শুক্রে শনি’ (১৯৮৪), ‘আলমের নিজের বাড়ি’ (১৯৮৪), ‘রজত জয়ন্তী’ (১৯৯২) ‘হিন্দু’ (১৯৯৪) ইত্যাদি।

দিব্যেন্দু পালিত তাঁর আত্মজৈবনিক রচনা ‘কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান’ গ্রন্থে বলেন—

> “আমার প্রথম প্রকাশিত বা প্রথম দিকে প্রকাশিত রচনার সঙ্গে কোনো পরিশীলিত মন ও পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির সম্পর্ক ছিল বলে মনে করি না। তাদের পিছনে যতো আবেগ সবই ছিল কৈশোরক, এক ধরনের শখ থেকে উদ্ভূত।”[১৬]

এই কারণেই সম্ভবত ১৯৫৫ সাল থেকে প্রথম দশ-এগারো বছরে লেখা ‘ছন্দ-পতন’, ‘নিয়ম’, ‘অন্ধকার পেরিয়ে’, ‘মায়াতরু’ প্রভৃতি আরো কয়েকটি গল্প দিব্যেন্দু পালিতের কোনো গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। গল্পগুলির সার্থকতা সম্পর্কে লেখকের সন্দেহই মূল কারণ। তিনি স্মৃতিকথায় লিখেছেন—

> “বিষয় ও বক্তব্যের মিল না থাকলেও ‘নিয়ম’ গল্পটির ভাষাবিন্যাসে সুবোধ ঘোষের প্রভাব ছিল স্পষ্ট। সত্যি বলতে, প্রায় প্রস্তুতিহীনভাবে যখন আমি হঠাৎ লেখা শুরু করি, গোড়ার দিকের সেইসব রচনায় শুধু সুবোধ ঘোষ কেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রভাবও কম ছিল না; পরবর্তীকালে প্রায় এককভাবে যে-প্রভাব বিস্তার করেছিলেন বিমল কর। এর কারণ কি অভিজ্ঞতার অভাব? হয়তো। মাটি কাঁচা থাকলে তাকে যে-কোনো ছাঁচেই ঢালা যায়। এই সব লেখকরা যে সেই সময় আমার ভাষার ওপর প্রভাব বিস্তার করেন এবং সহজেই, তাঁর কারণ একটিই : তখন আমি ছিলাম নিতান্তই লিখিয়ে, মন ছিল অপরিণত, নিজস্ব অভিজ্ঞতা-নির্ভর সত্তা বলে কিছু গড়ে ওঠেনি; যে কোনো ভালো লাগাকেই গ্রহণ করেছি নিজের মতো করে।”[১৭]

এই বক্তব্যের জের টেনে পরে আরো বলেন, “খুব কম লেখকই আছেন যাঁরা সাহিত্যজীবনের সূচনায় কোনো-না-কোনো প্রভাব ছাড়াই উপস্থিত করেন নিজেকে। কিন্তু, অভীপ্সা সৎ হলে একদিন-না-একদিন তাঁকে ভাবতেই হয় পরিবর্তনের কথা, নিজস্ব উপলব্ধির কথা। এই ভাবনার সময়টা সোজা সিঁড়ি ওঠার মতোই দুরূহ— এই পর্বে এসে

হাল ছেড়ে দেন বা হাঁপিয়ে ওঠেন এমন লেখকের সংখ্যাও অনেক। আমার সান্ত্বনা, আমি হাল ছাড়িনি; অন্যের ব্যবহৃত পোশাক ছেড়ে নিজের পোশাকটি চিনে নেবার জন্যে চেষ্টা করেছি প্রাণপণ।"[১৮]

এরই ফলে সূচনার দিন থেকে যা তিনি লিখেছেন সেগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন— ১৯৬৪-৬৫ সালের আগে এবং ঐ সময়ের পরে। ভালো হোক বা মন্দ হোক, দ্বিতীয় পর্বের রচনাগুলি একান্তভাবেই ছিল— 'পরিবর্তনের চিহ্নবাহক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই কোনো'।[১৯] লেখালিখির শুরু থেকে ১৯৬৪-১৯৬৫ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত রচনার মধ্যেই আছে 'মাছ', 'শীত-গ্রীষ্মের স্মৃতি', 'প্রতিনায়ক', 'দুঃসময়', 'সিতাংশু', 'চিলেকোঠা' প্রভৃতি প্রশংসিত রচনা। দেখা যায়, ১৯৬০ সালে প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত আধুনিক বাংলা ছোটোগল্পের নির্বাচিত সংকলন 'সিন্ধুর স্বাদ' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাঁর গল্প। তাঁর 'প্রতিনায়ক' গল্পটিকে সন্তোষকুমার ঘোষ জাত লেখকের লেখা বলে চিনিয়ে দিয়েছিলেন। এবং প্রায় পঁচিশ বছর পর এই সময়ের দুটি গল্প নিয়ে পর পর দুটি ছবি করেছেন বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত— 'শীত-গ্রীষ্মের স্মৃতি' এবং 'মাছ' গল্প অবলম্বনে 'গৃহযুদ্ধ'।

দিব্যেন্দু পালিতের ছোটোগল্পের খ্যাতি ও সমাদর প্রসঙ্গে সমালোচক পবিত্র সরকার বলেন— "দিব্যেন্দু পালিত নাগরিক মধ্যবিত্ত (নিম্নমধ্যবিত্ত সুদ্ধ) জীবনের, এই শ্রেণীর পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের, এমন সব গলিঘুঁজির সন্ধান রাখেন, এমন দুর্লভ নজর ও তীক্ষ্ণ সংবেদনে সেগুলিকে আমাদের গোচরে আনেন যে, অন্য জনপ্রিয় লেখকদের অনেকের লেখায় তা আমরা সচরাচর পাই না।"[২০] কখনো গভীর, কখনো আপাত-তুচ্ছ ঘটনা— যে কোনো বিষয়ই তাঁর ছোটোগল্পে অপ্রত্যাশিত ও ভিন্নতর তাৎপর্যে দেখা দিতে থাকে। 'শোকসভা', 'মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ', 'মহাদশায়', 'দাঁত', 'মানুষের মুখ', 'ট্রেসপাসার্স', 'মাড়িয়ে যাওয়া', 'একটি মন্দিরের জন্ম ও মৃত্যু', 'গন্ধের আবির্ভাব', 'মূকাভিনয়', 'সীমানা', 'অবসর', 'খেলা', 'ছাগল বিষয়ে দু-চার কথা' প্রভৃতি ছোটোগল্পগুলি বিষয় বৈচিত্র্যে ও তাৎপর্যে এক নতুনত্বের স্বাদ এনেছিল। এই সব গল্পের আবার অনেকগুলিই ভারতীয় ভাষায় ও ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে এবং প্রকাশিত হয়েছে 'দি ইলাস্ট্রেটেড উইকলি', 'দ্য স্টেটস্‌ম্যান' প্রভৃতি অন্যান্য পত্রিকায়।

১৯৫৫-৫৬ সালে 'দেশ' পত্রিকায় দিব্যেন্দু পালিতের প্রথম কবিতা 'তোমার ভালোবাসা' প্রকাশিত হলেও তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় অনেক পরে। ১৯৭০ সালে প্রকাশ পায় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রাজার বাড়ি অনেক দূরে'। এরপর 'আহত অর্জুন' (১৯৭০), 'কিছু স্মৃতি, কিছু অপমান' (১৯৭৬), 'শব্দ চাই, দাও' (১৯৮১), 'নির্বাসন, নয় নির্বাচন' (১৯৮৬), 'বড় ছেলে ছোট ছেলে' (১৯৯৩) 'অমৃত হরিণ' (১৯৯৭), 'স্মৃতির মতন কিছু' (২০০১), 'সতর্কবার্তা' (২০০৩) প্রভৃতি। দিব্যেন্দু পালিত নাগরিক জীবন নিয়েই কবিতা লিখেছেন। নগরজীবনের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-আনন্দ, নানা সমস্যায় দীর্ণবিদীর্ণ ছিন্নভিন্ন মানুষের কথা তাঁর কবিতার প্রধান বিষয়। জীবনানন্দের কবিতায় যে বিস্ময়বোধ ফুটে উঠেছিল দিব্যেন্দু পালিত সেই বিস্ময়বোধকে তুলে ধরেছেন। তিনি স্বীকারও করেছেন জীবনানন্দ তাঁর প্রিয় কবি ছিলেন। জীবনানন্দের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় বিস্ময়বোধ বিপন্ন হয়ে যাবার কষ্টে মানুষটি আত্মহননের পথ বেছে নেয়। দিব্যেন্দু পালিতও লেখেন—

"রাস্তার দু'ধার জুড়ে মাল্যবান—
অথচ মানুষ কতো একা!
মানুষের ভিতর মানুষ
ঘুমের ভিতর স্বপ্ন; না-পাওয়া সমস্ত সুখ ঢেলে দেয় তৎপর আবেগে— "[২১]

কিংবা,

"স্বপ্নের ভিতর কিংবা মৃত্যুর ভিতর কিংবা
জাগরণে, সূর্যের ভিতর
একাকী, নিঃসঙ্গ, এই আত্মঘাতী শোকের ভিতর।"[২২]

এইরকম একাকীত্ব, দুঃখহীনতা, বিস্ময়হীনতা, অসারতা আধুনিক মানুষের ধূসর মুখচ্ছবি সারি সারি ধরা পড়েছে দিব্যেন্দু পালিতের কবিতায়।

সারাজীবন সুদক্ষ সাংবাদিক থাকার ফলে এক ধরনের সাংবাদিক সত্তাও তাঁর কবি সত্তার সঙ্গে মিশে গেছে। 'কালো বৃষ্টি' কবিতায় লেখেন—

"পোখরান বাস্তব হলে নিশ্চিত অনেকে মারা যাবে
পরমাণু শব্দে খুব জোর আছে, বিস্ফোরণে আরও,
সুতরাং রাজনীতি প্রতিবাদ বুদ্ধিজীবী সভা আয়োজন
পোখরান বিষয়ে কিছু শব্দ লেখো যত দ্রুত পারো,
ইস্যুটা গরম থাকতে হোক তাঁর ব্যাপ্ত বিপণন;
বিষয় বিবেক— যারা বিবেকি তারাই এটা খাবে।"[২৩]

দিব্যেন্দু পালিতের কবিতাগুলিতে আছে সামান্য ব্যঙ্গ, মৃদু শ্লেষ এবং বিভিন্ন তির্যক বুদ্ধির অভিক্ষেপ। আগাগোড়া পরিণত, পরিমিত এবং প্রজ্ঞাবান এক বোধই তাঁর কবিতায় কাজ করে গেছে।

দিব্যেন্দু পালিতের উল্লেখযোগ্য পরিচয় ঔপন্যাসিক হিসাবে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সিন্ধু বারোয়াঁ' প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে আভেনীর প্রকাশনী থেকে। তিনি বলেন এর রচনাকাল ১৯৫৬ সালের দিকে। মাঝখানের তিন বছর তিনি উপন্যাসটিতে অনেক পরিমার্জনা ও সংশোধন করেন। উপন্যাসটি সম্পর্কে তিনি জানান—

"খুব কাঁচা লেখা। ...খারাপ লেখার যদি কোনও বহ্নি-উৎসব হয়, তাহলে আমার ওই লেখাটি প্রথম সে আগুনে নিক্ষেপ করা উচিত।"[২৪]

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের ছাত্র হওয়ায় দিব্যেন্দু পালিতের যেমন গর্ব হয়েছিল, তেমনি পরবর্তীকালে একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এখানে পড়তে এসে তাঁর মনে হয়েছিল—

"চোখের ও মনের সামনে সাহিত্যের জানালা-দরজা খুলে যাচ্ছে। বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে আমার এই যে পরিচয় হল তা আমার পরবর্তী লেখা এবং মানসিক গঠনে অনেক সাহায্য করেছিল। আমি সাহিত্য সম্পর্কে নতুনতর বোধে উত্তীর্ণ হই। আমার লেখালেখিও পাল্টাতে থাকে যত আমি বিশ্বসাহিত্যের পাতা ওলটাতে থাকি।"[২৫]

এই সময় সাহিত্যে নতুন আন্দোলন শুরু হয়েছিল। দিব্যেন্দু পালিতও এই সাহিত্য আন্দোলনের শরিক হয়েছিলেন। বয়সের পার্থক্য থাকলেও তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে

ছিলেন মতি নন্দী, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। বিমল কর এঁদের নিয়ে শুরু করেছিলেন 'ছোটগল্প-নতুনরীতি' আন্দোলন। বিমল কর তখন 'দেশ' পত্রিকার গল্প বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। গল্পে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কবিতাতেও নতুনত্ব আসে। নতুনত্বের এই ঝোঁক সৃষ্টি করেছিলেন 'কৃত্তিবাস' গোষ্ঠীর কবিরা। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখ।

এই সময় সাহিত্যিক ও শিক্ষাগুরু বুদ্ধদেব বসু কোনো এক প্রসঙ্গে তাঁকে বলেছিলেন সাহিত্যিক হতে গেলে 'কল্পনা শক্তি, কাহিনি বয়নের ক্ষমতা, চরিত্র-নির্মাণ ও সংলাপ-রচনা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকলে যে কেউ একটু চেষ্টা করলেই লেখক হতে পারেন। তবে 'সাহিত্যিক' হতে গেলে দ্রষ্টা হতে হয়। সেই থেকে দিব্যেন্দু পালিত কথাগুলি মননে গেঁথে নিয়ে সাহিত্য রচনায় বেশি করে আকৃষ্ট হন এবং নিজেকে 'সাহিত্যিক' আখ্যা দিতে পছন্দ করতেন।

১৯৬৫ সালে দিব্যেন্দু পালিতের পেশা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লেখার মধ্যেও পরিবর্তন আসে। বিশেষকরে ছোটোগল্প রচনার ভঙ্গি ও পরীক্ষা নিরীক্ষার ধরন বদলে গেছে। উপন্যাসে এই পরিবর্তন এসেছে ১৯৭১ সালে 'সন্ধিক্ষণ' উপন্যাসের মধ্যদিয়ে। তাঁর লেখার যে বৈশিষ্ট্য এক ধরনের ধারালো ভাব, ভাষায় মেদহীনতা, ঋজু এক ধরনের আত্মস্থভাব চলে এসেছিল। আসলে ১৯৬৫ সালের পর থেকে তিনি অনেক বেশি সময় ও সমাজ সচেতন হয়ে ওঠেন।

দিব্যেন্দু পালিতের সামগ্রিক সত্তার সঙ্গে মিশে আছে সাংবাদিক সত্তাও। সারাজীবন সুদক্ষ এবং বুদ্ধিদীপ্ত সাংবাদিকতা করে গিয়েছিলেন তিনি। কবিতা, গল্প, উপন্যাসে তাঁর সাংবাদিক সত্তার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। তাই তাঁর সাংবাদিক জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা উঠে এসেছে। 'সম্পর্ক', 'বিনিদ্র', 'ঢেউ', 'অন্তর্ধান', 'অনুভব' প্রভৃতি উপন্যাসে তাঁর সাংবাদিক সত্তার প্রকাশ ঘটেছে। এই উপন্যাসগুলিতে তিনি সংবাদপত্রের খবর যেমন হুবহু ব্যবহার করেছেন, তেমনি আবার প্রয়োজনে কাহিনি, চরিত্রের অদলবদল করেছেন। যেমন 'অনুভব' উপন্যাসের শেষে বলেছেন—

"এই উপন্যাসে বিভিন্ন সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, গ্রন্থ এবং নমুনা-সমীক্ষায় প্রাপ্ত কিছু তথ্য কাহিনীর প্রয়োজনমতো ব্যবহার করা হয়েছে।"[২৬]

উপরিউক্ত উপন্যাসগুলিতে তিনি মেয়েদের কিডন্যাপ, ধর্ষণ, খুন ('অন্তর্ধান', 'অনুসরণ'), কলগার্ল বা বেশ্যাপল্লীর মেয়েদের জীবনযাত্রা ('অনুভব'), বিজ্ঞাপন জগতের প্রসঙ্গ ('সম্পর্ক', 'বিনিদ্র', 'ঢেউ') প্রভৃতি সাম্প্রতিক বিষয়গুলিকে তুলে ধরেছেন। সংবাদপত্রের রিপোর্টের আকারে অনেক সময় উপন্যাসের গঠনও নির্মাণ করেছেন। বিজ্ঞাপন, বিপণন ও জনসংযোগ— এই নতুন জগৎটি দিব্যেন্দু পালিতই সাধারণের কাছে সর্বপ্রথম উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। কথাসাহিত্যিক দিব্যেন্দু পালিত এবং কবি দিব্যেন্দু পালিত— এই দুইয়ের সমন্বয়ে স্রষ্টা দিব্যেন্দু পালিতের সামগ্রিক সত্তা গড়ে উঠেছে। বিশেষকরে ছোটোগল্প এবং কবিতায় এর মিল বেশি। উপন্যাসেও কম নয়। দিব্যেন্দু পালিত মর্মকথায় বলেন, "দু'জনের মধ্যেই বিরোধ এত প্রবল যা অনুভব করলে আমি বিষণ্ণ হয়ে পড়ি।"[২৭]

প্রাবন্ধিক হিসাবেও দিব্যেন্দু পালিত পরিচিত ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ হলো— 'প্রেমপত্র' (১৯৭১), 'সঙ্গ ও প্রসঙ্গ' (১৯৯১), 'রোম আর রম্য' (১৯৯৫), 'সিনেমা থিয়েটার' (২০০২)। 'প্রেমপত্র' দিব্যেন্দু পালিতের ব্যক্তিগত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার ফসল। প্রথম জীবনের যে ব্যক্তিগত নানা ঘটনা মনের নিভৃতে ভেবেছিলেন তারই নীরব উচ্চারণ এখানে ফুটে উঠেছে। সাহিত্য সমালোচক হিসাবে দিব্যেন্দু পালিতের শ্রেষ্ঠত্ব ধরা পড়ে 'সঙ্গ ও প্রসঙ্গ' গ্রন্থে। 'অদ্বিতীয় প্রেমেন্দ্র মিত্র', বুদ্ধদেব বসুর ওপর 'স্যার', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ওপর 'দেহমনের বৈতালিক', সমরেশ বসুর উপর 'এক ধরনের আশ্রয়', 'অসীম রায়', 'বুদ্ধদেব বসুর কবিতা', 'অরুণকুমার সরকারের কবিতা', 'নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা', 'প্রেমের কবিতা', 'বাংলা কবিতা ও কৃত্তিবাস', 'বুদ্ধিজীবী,' 'বড্ডবেশি বাঙালি', 'পুজো সংখ্যা', 'বইমেলার সংস্কৃতি' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে তিনি বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বস্তুর গভীরে প্রবেশ করে সাহিত্যের দুর্লভ আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি তুলনামূলক সাহিত্যের ছাত্র হওয়ায় প্রবন্ধগুলিতে তুলনামূলক আলোচনাও করেছেন। যেমন, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'দ্বীপপুঞ্জে'র সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র তুলনামূলক আলোচনায়

সাহিত্যবোধের সঙ্গে সমাজচেতনার সুষ্ঠু সমন্বয় দেখিয়েছেন। স্মৃতিকথামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন 'আমার সময় এবং আমরা', 'কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান' প্রভৃতি।

১৯৮৮ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ভালোলাগা সিনেমাগুলির তিনি সাময়িক বা দৈনিক পত্রিকার জন্য রিভিউ হিসেবে লিখেছিলেন। সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক হওয়া সত্ত্বেও অনেকটা জীবিকার প্রয়োজনে এই প্রবন্ধগুলি তিনি লিখেছিলেন। কিন্তু এর পিছনে তাঁর অন্য এক ব্যক্তিত্ব সক্রিয় ছিল। প্রথম পাঠের সময় সিনেমা রিভিউ মনে হলেও সব প্রবন্ধগুলি একত্রে পড়লে বোঝা যায় তিনি এক অতিরিক্ত কিছু সাহিত্যের শাখায় যোগ করতে চান। 'সিনেমায় কলকাতা', 'দেশবিভাগ : চলচ্চিত্রে', 'ফিলমোৎসব-১৯৯০', 'থিয়েটার আরও এগোবে' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি পড়লে বোঝা যায় সিনেমা-থিয়েটার শিল্পের প্রকরণ ও শৈলীনির্মাণের বিশিষ্টতা।

রচনার রম্যতা, অভিজ্ঞতার অভিনবত্ব এবং সংবাদের সংগ্রহ— এই তিনের সমন্বয়ে 'রোম আর রম্য' রচনাটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। 'লর্ডস আর কমন্স', 'হায় নববর্ষ', 'হারানো পায়ের স্মৃতি', 'শৈশব থেকে শৈশবে' প্রভৃতি রচনাগুলিতে প্রাধান্য পেয়েছে ব্যক্তি বা কোনো প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে বিষণ্ণতা। ভ্রমণ পিপাসু মন আর সাংবাদিক অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ফুটে উঠে 'শরীরে মিললেও মনে মেলেনি' প্রবন্ধে।

দিব্যেন্দু পালিত 'শতবর্ষে চলচ্চিত্র' (দুই খণ্ড- ১৯৯৬, ১৯৯৮) নামে একটি গ্রন্থ সম্পাদনাও করেন নির্মাল্য আচার্য্যের সঙ্গে। চলচ্চিত্র যে একটি শক্তিশালী মাধ্যম, এটা দিব্যেন্দু পালিত বিশ্বাস করেছিলেন। এই বইটি সম্পাদনার আগেই নির্মাল্য আচার্য্যের ক্যান্সারে মৃত্যু হয়। ফলে সম্পাদনার দায়িত্ব তাঁর একার কাঁধেই পড়ে। এই সময় সিনেমার সঙ্গে দিব্যেন্দু পালিতের একটা যোগসূত্র হয়ে যায়। তিনি যখন আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করতেন, তখন তিনি সিনেমা সংক্রান্ত বিষয়েরই সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু তিনি মৌলিক চিত্রনাট্য কখনো লেখেননি। এমনকি লেখার চেষ্টাও করেননি। তবে দিব্যেন্দু পালিতের গল্প-উপন্যাস নিয়ে একাধিক চলচ্চিত্র হয়েছে।

দিব্যেন্দু পালিত নাটক লেখেননি। কিন্তু নাটক আলোচক হিসাবে তাঁর সুপরিচিতি আছে। 'মৌনমুখর' উপন্যাসে তাঁর প্রতিফলন দেখা যায়। এই উপন্যাসে একটি মেয়ের নাটকের প্রতি ভালোবাসা ও নাটককে আঁকড়ে ধরে জীবনযুদ্ধে টিকে থাকা প্রকাশ পেয়েছে।

স্টার থিয়েটার ভেঙে গ্রুপ থিয়েটারের জনপ্রিয়তার কারণও দেখান দিব্যেন্দু পালিত। ব্যক্তিজীবনেও তিনি নাটকের প্রতি ভালোবাসার কথা জানান। তাঁর অভিনয় করারও খুব সখ ছিল। তিনি স্মৃতিকথায় জানান, "স্কুলে ও কলেজে পড়ার সময় আমার নাটক ও অভিনয়ের প্রতি ঝোঁক ছিল।"[২৮] নাটক না লিখলেও পরবর্তীতে তিনি নাট্য-সমালোচনা করিয়ে নিতেন। 'আনন্দবাজার' পত্রিকার 'রবিবাসরীয়'তে পবিত্র সরকারকে দিয়ে নাট্য-সমালোচনা করিয়ে নিতেন। পবিত্র সরকার এ প্রসঙ্গে বলেন—

> "দিব্যেন্দুদা আমাকে দিয়ে অনেকগুলো নাট্য-সমালোচনা করিয়ে নিয়েছিলেন।...যেন আমি আনন্দবাজারের নাট্য-সমালোচক। প্রতি সপ্তাহেই আমার নাটকের সমালোচনা বেরোত।...বাংলায় গ্রুপ থিয়েটারে যত নাটক হয়, প্রথমদিকের দর্শকদের মধ্যে উনি একজন।...নাটক শেষ হবার পরে বসে নাটকের ভালোমন্দ নিয়ে আলোচনা করেছেন।...দিব্যেন্দুদা নিজে নাট্য-সমালোচনা বেশি করেন না।...কিন্তু ঐদিকে থাকলেও তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সমালোচক হতে পারতেন।"[২৯]

দিব্যেন্দু পালিত ছিলেন একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটোগল্পকার এবং প্রাবন্ধিক। আবার ব্যক্তিগত জীবনে দীর্ঘকাল সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাই সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র এবং নমুনা-সমীক্ষায় প্রাপ্ত অনেক ছোটো-বড়ো ঘটনা তাঁর গল্প-উপন্যাস-কবিতায় উঠে এসেছে। দিব্যেন্দু পালিত বেশ কয়েকবার বিদেশ ভ্রমণও করেছিলেন। যার ফলস্বরূপ তাঁর রচনায় আন্তর্জাতিকতাও স্থান পেয়েছে। প্রথম দিকের লেখায় তিনি সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, বিমল কর প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ফরাসি সাহিত্যিক আলব্যের কাম্যুর দ্বারা প্রভাবিত হন। নিজের স্বীকারোক্তিতে তিনি বলেছেন—

> "বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমি দস্তয়েভস্কি, কামু, কাফ্‌কা এবং আরও অনেকের রচনার সান্নিধ্যে আসি। কামু আমার খুব প্রিয় লেখক এবং তাঁর প্রায় সমস্ত লেখাই তন্নতন্ন করে পড়েছি, রচনার ওপর প্রভাব এমনি আসে না, যদি না কোনও লেখককে মনেপ্রাণে বুদ্ধি ও মেধা দিয়ে গ্রহণ করা যায়। কামুকে যথা সম্ভব সেইভাবে গ্রহণ করেছিলাম।"[৩০]

কাম্যুর উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধের মতোই তাঁর রচনা পরিপাঠ্য। তারপর ধীরে ধীরে তিনি নিজের চিন্তা-ভাবনায়, বুদ্ধিমত্তায় এবং সংযমশীলতায় নিজ লেখনির বৈশিষ্ট্যে বাংলা সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র জগৎ তৈরী করে নিয়েছেন।

তথ্যসূত্র :

১. রায়, প্রদীপ্ত (সম্পাদিত) : প্রিয়দর্শিনী, দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৩, পৃ. ১১৮

২. পালিত, দিব্যেন্দু : কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান, সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯১, পৃ. ৯৭

৩. রায়, প্রদীপ্ত (সম্পাদিত) : প্রিয়দর্শিনী, দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৩, পৃ. ১২২

৪. রায়, বব (সম্পাদিত) : আমার সময়, কলকাতা, ২য় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ১২

৫. তদেব : পৃ. ২৪

৬. রায়, প্রদীপ্ত (সম্পাদিত) : প্রিয়দর্শিনী, দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৩, পৃ. ১৭

৭. তদেব : পৃ. ৬৯-৭০

৮. রায়, বব (সম্পাদিত) : আমার সময়, কলকাতা, ২য় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ১০

৯. তদেব : পৃ. ১০

১০. তদেব : পৃ. ১১

১১. রায়, প্রদীপ্ত (সম্পাদিত) : প্রিয়দর্শিনী, দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৩, পৃ. ১২১

১২. রায়, বব (সম্পাদিত) : আমার সময়, কলকাতা, ২য় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৩

১৩. পালিত, দিব্যেন্দু : কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান, সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯১, পৃ. ৯৮

১৪. তদেব : পৃ. ৯৯

১৫. রায়, প্রদীপ্ত (সম্পাদিত) : প্রিয়দর্শিনী, দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৩, পৃ. ১২১

১৬. পালিত, দিব্যেন্দু : কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান, সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯১, পৃ. ৯৯

১৭. তদেব : পৃ. ৯৯-১০০

১৮. তদেব : পৃ. ১০০

১৯. তদেব : পৃ. ১০০

২০. সরকার, পবিত্র : মধ্যবিত্ততার মহাকাব্য, আজকাল, কলকাতা, ৩ জুলাই, ১৯৯৫, পৃ. ৫

২১. পালিত, দিব্যেন্দু : দেখা হয়ে যায়, দিব্যেন্দু পালিতের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, পৃ. ৩৭

২২. পালিত, দিব্যেন্দু : অপেক্ষা, দিব্যেন্দু পালিতের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, পৃ. ২৩

২৩. পালিত, দিব্যেন্দু : কালো বৃষ্টি, দিব্যেন্দু পালিতের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, পৃ. ১৬৭

২৪. রায়, বব (সম্পাদিত) : আমার সময়, কলকাতা, ২য় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ১০

২৫. তদেব : পৃ. ১৫

২৬. পালিত, দিব্যেন্দু : অনুভব, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ১৯৯৪, পৃ. ১২৭

২৭. রায়, বব (সম্পাদিত) : আমার সময়, কলকাতা, ২য় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৫

২৮. পালিত, দিব্যেন্দু : কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান, সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯১, পৃ. ৯৯

২৯. রায়, প্রদীপ্ত (সম্পাদিত) : প্রিয়দর্শিনী, দিব্যেন্দু পালিত বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৩, পৃ. ২০

৩০. রায়, বব (সম্পাদিত) : আমার সময়, কলকাতা, ২য় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ১৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের পর্ববিভাগ ও বিষয়বৈচিত্র্য

রচনার উৎকর্ষ বিচারে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসগুলিকে চারটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রত্যেকটি পর্বের উপন্যাসগুলিকে কালানুক্রমিক উল্লেখ করা হলো—

ক. প্রথম পর্ব ['সিন্ধু বারোয়াঁ' (১৯৫৯) থেকে 'প্রণয়চিহ্ন' (১৯৭১)] :

'সিন্ধু বারোয়াঁ' (১৯৫৯), 'সেদিন চৈত্রমাস' (১৯৬১), 'ভেবেছিলাম' (১৯৬৪), 'মধ্যরাত' (১৯৬৭) এবং 'প্রণয়চিহ্ন' (১৯৭১)।

খ. দ্বিতীয় পর্ব ['সন্ধিক্ষণ' (১৯৭১) থেকে 'সবুজ গন্ধ' (১৯৮২)] :

'সন্ধিক্ষণ' (১৯৭১), 'সম্পর্ক' (১৯৭২), 'আমরা' (১৯৭৩), 'বৃষ্টির পরে' (১৯৭৪), 'বিনিদ্র' (১৯৭৬), 'চরিত্র' (১৯৭৬), 'একা' (১৯৭৭), 'উড়োচিঠি' (১৯৭৮), 'অহংকার' (১৯৭৯) এবং 'সবুজ গন্ধ' (১৯৮২)।

গ. তৃতীয় পর্ব ['সহযোদ্ধা' (১৯৮৪) থেকে **'গৃহবন্দী' (১৯৯১)] :**

'সহযোদ্ধা' (১৯৮৪), 'ঘরবাড়ি' (১৯৮৪), 'আড়াল' (১৯৮৬), 'সোনালী জীবন' (১৯৮৬), 'ঢেউ' (১৯৮৭) 'স্বপ্নের ভিতর' (১৯৮৮), 'মাইন নদীর জল' (১৯৮৮), 'অন্তর্ধান' (১৯৮৯), 'অবৈধ' (১৯৮৯), 'সিনেমায় যেমন হয়' (১৯৯০), 'অনুসরণ' (১৯৯০) এবং 'গৃহবন্দী' (১৯৯১)।

ঘ. চতুর্থ পর্ব ['সংঘাত' (১৯৯২) থেকে 'একদিন সারাদিন' (২০০৩)] :

'সংঘাত' (১৯৯২), 'ভোরের আড়াল' (১৯৯৩), 'অনুভব' (১৯৯৪), 'অচেনা আবেগ' (১৯৯৫), 'সেকেন্ড হনিমুন' (১৯৯৭), 'মৌনমুখর' (১৯৯৮), 'মাত্র কয়েকদিন' (১৯৯৮), 'যখন বৃষ্টি' (১৯৯৯), 'হঠাৎ একদিন' (২০০০), 'সোহিনী এখন কোথায়' (২০০০), 'বহুদূর অভিমান' (২০০২) এবং 'একদিন সারাদিন' (২০০৩)।

বিষয়-ভাবনার বৈচিত্র্যে দিব্যেন্দু পালিত এক একক ধারার শিল্পী। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং সামাজিক পরিবেশের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন উপন্যাসের কাহিনি-পরিকল্পনায় তিনি সব সময় নতুন অভিজ্ঞতা যুক্ত করেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সিন্ধু

বারোয়াঁ'র বিষয়বস্তুতে উঠে এসেছে ত্রিকোণ প্রেমের আবহ। কলেজ পড়ুয়া অরুন্ধতী বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে বেশি দিন থাকতে পারেনি। পাড়ার বখাটে যুবক সুনীলের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের কারণে তাকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়। দ্বিতীয় উপন্যাস 'সেদিন চৈত্রমাস'-এ বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া এষা সহপাঠী অমলেন্দু ও স্বামী মৃণালকান্তি— এই দুই পুরুষের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজের মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগেছে। তৃতীয় উপন্যাস 'ভেবেছিলাম'-এ চাকরি, প্রেম, জীবনের নানা বাঁধা, নানা সমস্যা ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে মধ্যবিত্ত যুবকের আশা ও আশাভঙ্গের বেদনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমরা দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসগুলিকে বিষয়বস্তুর নিরিখে কয়েকটি দিক থেকে শ্রেণিবিন্যাস করতে পারি। যেমন—

১. প্রেমের উপন্যাস— 'সিন্ধু বারোয়াঁ', 'সেদিন চৈত্রমাস', 'অচেনা আবেগ', 'মাত্র কয়েকদিন', 'হঠাৎ একদিন' ইত্যাদি।

২. লেখকের ব্যক্তিজীবন কেন্দ্রিক— 'ভেবেছিলাম'।

৩. মৃত্যুবোধ বিষয়ক— 'সন্ধিক্ষণ', 'বৃষ্টির পরে', ' সবুজ গন্ধ' ইত্যাদি।

৪. দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন বিষয়ক— দিব্যেন্দু পালিতের বেশিরভাগ উপন্যাসের মূল বিষয় দাম্পত্যজীবনের সমস্যা। দীর্ঘ কয়েক বছরের একটানা সংসার জীবনে আসে ক্লান্তি বা অবসাদ। স্বামী-স্ত্রীর পুরনো সম্পর্ক তখন আর ফিরে পাওয়া যায় না। পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে চলে। যেমন— 'প্রণয়চিহ্ন', 'অবৈধ', 'সেকেন্ড হনিমুন', 'যখন বৃষ্টি', 'সিনেমায় যেমন হয়', 'আড়াল', 'মাইন নদীর জল', 'একদিন সারাদিন' ইত্যাদি।

৫. রাজনীতি বিষয়ক— দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে নকশাল আন্দোলনের প্রভাব পড়েছে। যেমন— 'আমরা', 'সহযোদ্ধা', 'ঢেউ', 'গৃহবন্দী', 'উড়োচিঠি' ইত্যাদি।

৬. বিজ্ঞাপন জগতের প্রসঙ্গ বিষয়ক— 'সম্পর্ক', 'বিনিদ্র', 'ঢেউ' ইত্যাদি।

৭. নিরুদ্দেশ, অপহরণ বিষয়ক— 'অন্তর্ধান', 'অনুসরণ', 'সোহিনী এখন কোথায়'।

৮. মেসবাড়ির মেয়েদের কাহিনি বিষয়ক— 'মধ্যরাত', 'স্বপ্নের ভিতর' ইত্যাদি।

৯. নারীর অধিকার বিষয়ক— 'স্বপ্নের ভিতর', 'সংঘাত', 'অনুভব' ইত্যাদি।

১০. নাট্যজগৎ বিষয়ক— 'মৌনমুখর'।

১১. অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের বিষয়ক— 'সোনালী জীবন'।

ক. প্রথম পর্ব ['সিন্ধু বারোয়াঁ' (১৯৫৯) থেকে 'প্রণয়চিহ্ন' (১৯৭১)] :

এই পর্বের উপন্যাসগুলি হলো— 'সিন্ধু বারোয়াঁ' (১৯৫৯), 'সেদিন চৈত্রমাস' (১৯৬১), 'ভেবেছিলাম' (১৯৬৪), 'মধ্যরাত' (১৯৬৭) এবং 'প্রণয়চিহ্ন' (১৯৭১)।

দিব্যেন্দু পালিত প্রথম জীবনে কয়েকটি প্রেমের উপন্যাস লিখেছিলেন। এগুলির কাহিনি সরল এবং একরৈখিক। উপন্যাসগুলিতে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, নেই চরিত্রের গভীরতা। সমালোচকের মতে, "দিব্যেন্দু পালিতের লেখায় প্রেম এসেছে, কিন্তু তার প্রকাশ খুব মৃদু। উচ্ছ্বাসটা অত তীব্র নয়।"[১] আসলে দিব্যেন্দু পালিতের এটি ব্যক্তি অভিজ্ঞতার ফল। এই সময় তাঁর বয়স খুবই কম ছিল। তখন তিনি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রেমের কথা উপন্যাসে ব্যক্ত করেছেন। তখন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সংসারে প্রেমের প্রকাশও ছিল খুবই চাপা। 'সিন্ধু বারোয়াঁ', 'সেদিন চৈত্রমাস' প্রভৃতি উপন্যাসে প্রেমের নিটোল কাহিনি প্রকাশ পেয়েছে।

দিব্যেন্দু পালিতের প্রথম উপন্যাস 'সিন্ধু বারোয়াঁ'। উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে আভেনির প্রকাশনী থেকে। তখন লেখকের বয়স কুড়ি বছর। এই সময় তাঁর পিতা হঠাৎ মারা যান। সদ্য স্বর্গীয় পিতাকেই তিনি উপন্যাসটি উৎসর্গ করেন। উপন্যাসটিতে দুটি ত্রিকোণ প্রেমের বৃত্ত আছে। প্রথম বৃত্তে জয়ন্তী-সৌম্য-অরুন্ধতী এবং দ্বিতীয় বৃত্তে অতনু-জয়ন্তী-সৌম্য। এরা প্রত্যেকেই বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া, প্রথম বর্ষের ছাত্র। জয়ন্তী বাংলা বিভাগের, সৌম্য ইংরেজি বিভাগের, মলিনা দর্শন বিভাগের। অরুন্ধতী তাদের থেকে এক ক্লাস নিচে পড়ে। ততোদিনে সৌম্য ইংরেজিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। জয়ন্তী ও সৌম্য আলাদা বিভাগের হলেও সবসময় এক সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশেছে। সেই মেলামেশা ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ হয়। কিন্তু অরুন্ধতীকে দেখে সৌম্যর ভাবনা পাল্টে যায়। সে জয়ন্তীর প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করে। অরুন্ধতীর প্রেমে পাগল হয়ে ওঠে। অরুন্ধতীকে প্রথম দেখাতেই সৌম্যর মনে হয়েছে—

"চেতনার কোনো এক দুর্গম স্তরে অরুন্ধতী যেন একটা প্রবল ঝড় তুলেছে।...যেন একটা স্তব্ধ ঢেউ বুকের মধ্যে তোলপাড় করছে, ফেনায়িত তরঙ্গে ভেসে যাচ্ছে সবকিছু!"[২]

এর আগে অনেক মেয়ের সঙ্গে সে মিশেছে, সে পরিচয় কখনো কখনো ঘনিষ্ঠ আলাপেও পরিণত হয়েছে। কিন্তু এরকম মনের ভেতর তীব্র অনুভূতি আসেনি। ঘটনাক্রমে অরুন্ধতীরা সৌম্যদের বাড়িতেই ভাড়া থাকে। নিত্য দেখা হয় তাদের। সেই পরিচয়ে তারা পরস্পরের প্রেমে পড়ে। প্রেম একসময় আরো ঘনিষ্ঠ করে দুজনকে। তাদের প্রেমের মাঝখানে আর একজন তৃতীয় ব্যক্তি আসে সুনীল। সুনীল সৌম্যর পাড়াতেই থাকে। বড়লোক বাপের একমাত্র ছেলে সুনীল। সৌম্যর চেয়ে বয়সে একটু বড়ো। তবুও একসময় সৌম্যর সঙ্গে পড়েছিল। কয়েকবার ফেল করার পর পড়া ছেড়ে দিয়েছিল সুনীল। এখন পাড়ার বখাটে ছেলেদের মধ্যে সে এক নাম্বার। কয়েকদিন ধরে অরুন্ধতীর পিছনে লেগেছিল। অরুন্ধতী কথাটা সৌম্যকে জানালেও সৌম্য কোনো ভ্রূক্ষেপ করেনি। সুনীল কোনোভাবেই অরুন্ধতীর প্রেমের কাছে পৌঁছতে পারেনি। সুনীল হঠাৎ একদিন তাদের বাড়ি চলে যায়। এতে অরুন্ধতী ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু এইদিকে আর গল্প এগোয়নি। গল্পের বাঁক এসেছে অন্যদিকে। অরুন্ধতীর বাবা মেয়ের বিয়ে ঠিক করে ফেলে এক চাকরিজীবী ছেলের সাথে। ফার্ন রোডে বাড়ি, নাম বিভাস। অরুন্ধতী বিয়ের কথা সৌম্যকে জানালে সৌম্য কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি বিয়ের কথা। সে শুধু পড়াশুনা নিয়ে ভেবেছে। ভেবেছে ভবিষ্যতে সে আরো অনেকদূর পর্যন্ত এগোবে। ফলে সৌম্য বিয়ের কথা তার বাবা-মাকে বলতে পারেনি। অরুন্ধতীর বিয়ের কয়েকদিন আগে সে কাপুরুষের মতো পালিয়ে গেছে পুরীতে। তারপর ফিরে এসে নিঃসঙ্গতায় ভুগেছে। তার কাছে জীবন হয়ে উঠেছে অসহ্য। সে আবার জয়ন্তীকে ফিরে পেতে চায়।

অরুন্ধতীকে বিয়ে করে বিভাস সুখী হতে পারেনি। অরুন্ধতীর প্রেম সৌম্যর জন্য ছিল অন্ধ। বিয়ে করে অরুন্ধতী বিভাসের সাথে একসঙ্গে থাকেনি। ফলে উভয়ের মধ্যে বিবাহটা ছিল একটা সামাজিক বন্ধনমাত্র। পিতৃমাতৃহীন বিভাস চেয়েছিল সুখ। তার কাছে জীবন ছিল সহজ সরল। পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধে সে অনাবিল আনন্দ খুঁজেছিল। লেখকের কথায়—

"সুন্দর এই পৃথিবী, কত সুন্দর; ছোটো ছোটো সুখ, ছোটো ছোটো দুঃখ, শোক, যন্ত্রণা এবং আশা; সব কিছুর মধ্যে এক জ্যোতির্ময় আলোর সন্ধান করছিল।"[৩]

বিভাস বিয়ে করে সুখী হবে এই আশা করেছিল। কিন্তু তার এখন পৃথক শয্যা। সহজ, স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার মধ্যে তবুও সে অরুন্ধতীকে সন্দেহ করেনি। সেই বখাটে সুনীলের সঙ্গে দার্জিলিং ঘুরতে যেতে দিয়েছিল। বিভাস ভেবেছিল ঘুরে এসে যদি অরুন্ধতীর মন ভালো হয়। কিন্তু অরুন্ধতী আগের থেকে আরো খিটখিটে হয়ে যায়। তার চেহারায় আরো বেশি করে ক্লান্তি, বিষণ্ণতা ও উৎকণ্ঠা দেখা দেয়। ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে বোঝা যায় অরুন্ধতী সন্তানসম্ভবা। বিভাসের কাছে এর থেকে আর খুশির খবর হয় না। সে নতুনভাবে জীবন শুরু করার কথা ভাবে। কিন্তু নার্স ও কাজের মাসির কথায় ছেলেটা যেন তাদের কারোর মতো হয়নি। নিজের সন্তানকে ঘৃণা হয় অরুন্ধতীর। ছেলেকে মনে হয় একটা 'জানোয়ার'। 'অকারণ ঘৃণার শিহরে রি-রি করে অরুন্ধতীর সারা দেহ'। সে 'জানোয়ার'টার অস্থির চিৎকার শ্বাসরোধ করে শান্ত করে। আর নিজেও আত্মহত্যার দিকে এগিয়ে যায়।

'সেদিন চৈত্রমাস' দিব্যেন্দু পালিতের দ্বিতীয় প্রেমের উপন্যাস। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালে। এই সময় তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এখানেও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া যুবক-যুবতির প্রেমের ছবি লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। উপন্যাসটি যখন 'বসু চৌধুরী' প্রকাশনী থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় তার সূচনায় লেখা ছিল— "প্রেম ও যৌনতা বিষয়ে মৌল স্বাদযুক্ত উপন্যাস 'সেদিন চৈত্রমাস'।"[৪]

এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র এষা। সে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া যুবতী। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাড়ির লোকজন তাকে জোর করে বিয়ে দেয়। স্বামীকে এষার কোনোমতেই পছন্দ হয়নি। বিয়ের প্রথম রাত থেকেই স্বামী সম্পর্কে তার ঘৃণা আসে। বিদেশে স্বামীর বড়ো চাকরি থাকলেও সঙ্গে যায়নি। এষা বাপের বাড়িতে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করতে চায়। বিবাহিতা এষা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় সহপাঠী অমলেন্দুর সংস্পর্শে আসে। তার প্রতি আবেগ, আকর্ষণ এবং ভালোবাসা জন্মে। অমলেন্দুর ঘনিষ্ঠতায় এষা খুঁজে পায় বেঁচে থাকার আশ্বাস আর ভবিষ্যতের আশ্রয়। অমলেন্দুকে কাছে পেয়ে সে জীবনকে নতুনভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে। স্বামীকে ডিভোর্স দিয়ে অমলেন্দুর সঙ্গে সংসার করতে চায়। কিন্তু প্রেমিক

যুবক অমলেন্দু তাকে সঙ্গ দিয়েছিল, ভালোবাসা দিতে পারেনি। তার শরীর নিয়ে খেলেছিল, ভালোবাসার মর্যাদা দিতে পারেনি। বেকার যুবক অমলেন্দুর জন্য অপেক্ষা করতে চেয়েছিল। কিন্তু অমলেন্দুর কথাবার্তায় তার সম্পর্কে কোনো আবেগ নেই। অমলেন্দু আশ্রয় দিতে পারেনি তাকে। এই ব্যর্থ প্রেমে এষা নিজেকেই অপরাধী মনে করেছিল। আত্মহত্যার কথা মাথায় আসে তার। কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এষা বুঝতে পারে মৃত্যুর মধ্যদিয়ে তার মানসিক নিবৃত্তি সম্ভব নয়। তাই দুই পুরুষের সান্নিধ্যে না থেকে সে স্বাবলম্বী হতে চেয়েছিল। স্কুলের হেডমিস্ট্রেস অঞ্জলি দিদিমণির কাছে পরামর্শ নিয়েছে কীভাবে একা বেঁচে থাকা যায়। শেষ পর্যন্ত সে একটা স্কুলের শিক্ষকতার চাকরি গ্রহণ করে। প্রেম, বিবাহ, সংসার ছেড়ে একটা আত্মসুখী, নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের পথ বেছে নিয়েছে। ব্যর্থ প্রমের আখ্যান হলেও 'সেদিন চৈত্রমাস' আধুনিক শিক্ষিত নারীর বিদ্রোহী চেতনার উদ্ভাস।

দিব্যেন্দু পালিতের ব্যক্তিজীবন কেন্দ্রিক উপন্যাস 'ভেবেছিলাম'। এটি দিব্যেন্দু পালিতের তৃতীয় উপন্যাস। উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে সুরভি প্রকাশনী থেকে। এর আগে এটি মুদ্রিত হয় 'উল্টোরথ' পত্রিকায়। উপন্যাসটি আকারে খুবই ছোটো। আটটি মাত্র পরিচ্ছেদ। উপন্যাসটি লেখক উৎসর্গ করেছেন শ্রীযুক্তা যূথিকা নাগকে।

'ভেবেছিলাম' উপন্যাসটি উত্তম পুরুষে লিখিত। গল্পের কথক একজন ভাববাদী যুবক। তার বয়স তিরিশ বছর। সেই সময় দিব্যেন্দু পালিতেরও বয়স প্রায় সমান ছিল। পিতা মারা যাওয়ার পর যুবক দিব্যেন্দু ১৯৫৮ সালে ভাগলপুর থেকে কলকাতায় আসেন কাজের জন্য। এই সময় কাজ তো দূরের কথা নিজের পেটের ভাত টুকুও জোটাতে তিনি ব্যর্থ। বাড়িতে বৃদ্ধা মাকে ভাই-বোন ও সংসারের সব দায়িত্ব দিয়ে এসেছেন। মায়ের জন্য তাঁর মন খারাপ হতো সবসময়। এই উপন্যাসের কথকের মুখের ভাষা দিয়ে লেখক বুঝিয়েছেন তাঁর মায়ের স্মৃতি-বিজড়িত বেদনা—

> "মা-র চুলে পাক ধরেছে— এই কয়েক মাসে তিনি অত্যধিক জীর্ণ হয়েছেন ও তাঁর কয়েক বছর বেড়ে গেছে...। মা, আমার মা, আমার বুড়ি মা— আবেগের আতিশয্যে এবংবিধ ভাবতে ভাবতে আমার ইচ্ছে করছিল মাকে প্রবলভাবে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরি ও তাঁর ললাট চুম্বন করি।"[৫]

এই উপন্যাসটিতে ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত লেখকের ব্যক্তিজীবনের নানা ঘটনা স্থান পেয়েছে। দিব্যেন্দু পালিত জানান, এই ছয়-সাত বছর শুধু তাঁকে বেঁচে থাকার জন্যেই বহু পরিশ্রম, গ্লানি ও অপমান সহ্য করতে হয়েছে। তিনি স্মৃতিকথায় জানান—

> "সে বড়ো নিঃসঙ্গ সময় : ক্ষুধা, ভয়, একাকীত্ব, অসহায়তা, মানুষের প্রবঞ্চনা ও অকারণ বিরুদ্ধাচরণ— এই কয়েক বছরে আমাকে উপর্যুপরি এতো আঘাতের সম্মুখীন হতে হয় যে, মনে হতো, হেরে যাচ্ছি, খুব তাড়াতাড়ি একটা বিকল্প খুঁজে না পেলে আর টানতে পারব না নিজেকে। কিন্তু, এই বোধও স্থায়ী হতো না বেশিক্ষণ। আশঙ্কা একা আসত না; সঙ্গে নিয়ে আসত জীবনযাপন সম্পর্কে একরকম উদাসীনতা— যা ক্লান্তি ও বিষণ্ণতা থেকে টেনে নিতে পারে নতুনতর শক্তি সঞ্চয়ের দিকে।"[৬]

এই ধরনের অভিজ্ঞতার ছাপ স্পষ্টভাবে পড়েছে 'ভেবেছিলাম' উপন্যাসের গল্প কথকের উপর। গল্প কথকের কোনো নাম নেই। বলা চলে দিব্যেন্দু পালিত নিজের কথাই বলছেন। গল্পের কথক এম. এ. পাশ করে বেকার হয়ে পড়েছেন। অনেক ইন্টারভিউ দিয়েও কোনো লাভ হয়নি। 'কর্মহীনতার কমপ্লেক্স' ঘিরে ধরেছে তাকে। শহরের পথে তিনি একা এবং নিঃসঙ্গ হেঁটেছেন। তার কাছে বর্তমান নেই, ভবিষ্যতের যাবতীয় চিন্তাও তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। বন্ধু নিকুঞ্জকে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যা এবং নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করেছেন—

> "আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতিবছর কিছু-না-কিছু শিক্ষিত যুবককে মানপত্র দিয়ে জঞ্জাল পরিষ্কার করার দায়িত্ব পালন করছে। অর্থাৎ কর্পোরেশনের লরি। যেন সেই স্তূপীকৃত জঞ্জালের একাংশে আমি নিজেও পড়ে আছি, পরস্পরের বিক্ষোভের গন্ধে সর্বাঙ্গ ক্রমশ পচন ধরেছে।"[৭]

কথক বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে দার্শনিক ভঙ্গিতে অজস্র মানুষের মুখ দেখেছেন। কালো মুখ, ফর্সা মুখ, ভরা মুখ, সুন্দর মুখ, ভাঙা মুখ, উজ্জ্বল মুখ কিংবা কুৎসিত মুখ— সমস্ত মুখই তাঁর কাছে ভাবলেশহীন এবং নির্বিকার। এদের মধ্যে কথক আত্মহত্যাপ্রবণ মানুষদেরও

দেখেছেন। বন্ধু নিকুঞ্জর কাছে দেখেছেন সেই শূন্যতা। তার নিস্পৃহ, নিরুদ্যম দৃষ্টি কথককে অপূর্ণ, অসহায় ও নিঃসঙ্গতায় ঠেলে দিয়েছে। তিনি বুঝেছেন, প্রকৃত মৃত্যুর আগেই এই সব মানুষের মৃত্যু ঘটে। এই সব অভিজ্ঞতার কথা লেখক অকপটে স্বীকার করেছেন তাঁর স্মৃতিপটে—

> "মনে হতো নিজের মধ্যে প্রত্যেক মানুষই বড়ো একা; একের সঙ্গে অন্যের পারস্পরিক সম্পর্ক যতোই নিবিড় হোক, মাঝখানে কোথাও আছে এক অতিকায় লোহার দরজা— ভারী খিল আঁটা, তার আড়ালে বসে প্রত্যেকেই ছুঁয়ে যাচ্ছে নিজের অপূর্ণতা, কথা বলছে, কেঁদে যাচ্ছে আপন মনে।"[৮]

কলকাতায় আসার প্রথম দিকের অভিজ্ঞতায় লেখক মানুষের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেননি। এই সময় তিনি এমন কিছু ব্যক্তি মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন, যাদের দয়ায় এবং মমত্ববোধে তিনি উপকৃত। চারিদিকের ক্লেদ, গ্লানি এবং কুশ্রীতার মধ্যেও যে মানুষ চোখ তুলে তাকায় মানুষের দিকে— বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, আশ্রয়ের জন্যে, ক্ষমা প্রার্থনা ও চরিতার্থতার জন্যে, তার মূলে আছে কিছু মানুষের শুভবোধ। যাঁরা স্বার্থহীনভাবে দুঃস্থ ধরিত্রীর দিকে ক্রমাগত বাড়িয়ে দিচ্ছেন শুশ্রূষার হাত। এই ধরনের অভিজ্ঞতার কথা তিনি উপন্যাসের কথকের মুখ দিয়ে বলেছেন—

> "মানুষ মাত্রেই ভালোমানুষ, সৎ ও উদার এবং ভালোত্বের ধারাবাহিকতা মনের অগোচরেই তারা রক্ষা করে থাকে; অবচেতনার শুদ্ধতা পৃথিবীকে নিরন্তর শুদ্ধ করে তোলে।"[৯]

১৯৬১ সালে লেখক ইংরেজি 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকা'য় সাব এডিটরের কাজে যোগ দেন। আলোচ্য উপন্যাসেও কথক অস্থায়ী কর্মী হিসেবে ইংরেজি 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকায় সাব এডিটর এবং স্টাফ রিপোর্টার-এর কাজে যোগদান করে। চাকরি জীবনে এসে সে ঘটনা সূত্রে মানুষের প্রতি বিশ্বাস ধরে রাখতে পারেনি। সেইসব কথা সে আত্মবিশ্লেষণের ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছে। কথক বরাবর সৎ এবং নিঃস্বার্থ ছিল। কিন্তু সংবাদপত্র অফিসে তাকে আভ্যন্তরীণ রাজনীতির শিকার হতে হয়েছে। সময় মতো ভালো কাজ করলেও সে সকলের প্রিয়ভাজন হতে পারেনি। মিস্টার চৌধুরী তাকে গোপনে পরীক্ষা করে। অফিসার

সেনগুপ্ত তাকে সুব্যবহারের আড়ালে চাকরি থেকে বরখাস্তের নোটিশ দিয়েছে। হেলথ ডিপার্টমেন্টে তদন্ত করতে গিয়ে বঞ্চনা এবং যন্ত্রণার আর এক অভিঘাত দেখেছে সে। কাজে অনুপস্থিত থাকার জন্য চ্যারিটেবল ডিসপেনসারির নব্বই টাকা মাইনের স্টাফ নার্স প্রীতিলতাকে ডিসচার্জ করা হয়েছে। প্রীতিলতা বিধবা এবং সন্তানসম্ভবা হওয়া সত্ত্বেও অফিসে তাকে খেসারত দিতে হয়েছিল। সে অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটায়। কিন্তু তার নামে এক বা একাধিক ব্যক্তির কারসাজিতে এখনো মাইনে উইথ ড্র করা হয়। এই সব বিষয় যেন তদন্ত করা না হয় তার জন্য হেলথ অফিসার ডক্টর এল. এম. ঘোষ সুকৌশলে ব্যাপারটি এড়িয়ে গেছে। অফিসার সেনগুপ্ত প্রেসের সমস্ত কাজ গণপতিবাবু এবং তাকে দিয়েছে এডিটর জ্যোতিষবাবু না থাকায়। আর্লি মর্নিং এডিশনের মেক আপের কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য রাতে কাজ থাকলেও বন্ধু বীরেনের দাদার অ্যাক্সিডেন্টের খবর পেয়ে অফিস থেকে চলে যেতে হয়। খবরটা যদিও মিথ্যে। এতে তার কোনো দোষ ছিল না। বীরেনের প্রেমিকা শ্যামলী বীরেনকে ঠকিয়েছে। শ্যামলী বীরেনের প্রেমের মর্যাদা দেয়নি। সে একটা পয়সাওয়ালা ছেলের সাথে বিয়ে ঠিক করেছে। এদিকে বীরেন একটা দামী আংটি শ্যামলীকে দিয়েছে। শ্যামলী সেটা ফেরত না দিয়ে বেমালুম হজম করেছে। এর ফলে বন্ধুর প্রেম সম্পর্কিত বিবাদে তারা রাস্তায় মারপিটের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে এবং পুলিসে তাদের থানায় নিয়ে যায়।

এই সব ঘটনার এক মাস পরে অফিসে গেলে সেনগুপ্ত তার হাতে রেজিগনেশন লেটার ধরিয়ে দেয়। 'কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্টে' লাল কালিতে আন্ডারলাইন করা ছিল দুটো পয়েন্ট—

> "ডিউটির সময়ে অ্যাক্সিডেন্টের অজুহাত দেখিয়ে ছুটি নেওয়া এবং পরে, মধ্য রাস্তায় মারপিট, তারপর থানায় গমন...এবং হেলথ ডিপার্টমেন্টে অফিসিয়াল সিক্রেট ফাঁস করার অভিযোগে অভিযুক্ত আমি।"[১০]

নিরপরাধ কথক চাকরি হারিয়ে অফিস থেকে রাস্তায় নেমে পড়েছে। শূন্যতা তাকে আরো অন্ধকার ও আচ্ছন্নতায় ঠেলে দিয়েছে। গল্পকথকের স্রষ্টা লেখক দিব্যেন্দু পালিতও ব্যক্তিজীবনে ১৯৬৫ সালে 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রিকার কাজ ছেড়ে দেন। এই সমস্ত দিক বিচার করে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে লেখকের ব্যক্তিজীবনের দলিল।

মেসবাড়ির মেয়েদের জীবনকাহিনি নিয়ে দিব্যেন্দু পালিত দুটি উপন্যাস লিখেছেন— 'মধ্যরাত' এবং স্বপ্নের ভিতর'। দুটি উপন্যাসের কাহিনি ও চরিত্র প্রায় একই। 'মধ্যরাত' দিব্যেন্দু পালিতের প্রথম যৌবনের লেখা বলে চরিত্রগুলির মধ্যে মনের গভীরতা কম প্রকাশ পেয়েছে। আর 'স্বপ্নের ভিতর' পরিণত বয়সে লেখা বলে চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে গভীর অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে।

'মধ্যরাত' দিব্যেন্দু পালিতের চতুর্থ উপন্যাস। ১৯৬৭ সালে এটি 'চতুষ্পর্ণা' প্রকাশনী থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এর আগে এটি 'চতুষ্পর্ণা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। উপন্যাসটি লেখক ভাগলপুর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী সুশীলরঞ্জন মহাশয়কে উৎসর্গ করেন।

এই উপন্যাসটির মূল কেন্দ্রে আছে 'নষ্টনীড়' নামে একটি বাড়ি। সেখানে অভিভাবকহীন স্বাধীন মেয়েরা বাস করে। মেয়েগুলির বয়স বেশিরভাগই ত্রিশের আশপাশ। কিছু মেয়ে বাবা-মা মারা যাবার পর এখানে চলে এসেছে। কিছু মেয়ের স্বামী মারা যাওয়ার পর শ্বশুর বাড়ির লোকজনের অত্যাচারে চলে এসেছে। এই সব মেয়েরা স্বাধীনভাবে বাঁচতে নিজেদের মতো চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে। আসলে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে শিক্ষাদীক্ষায় উন্নতি হওয়ায় ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও স্বাবলম্বী হতে চেয়েছিল। বাঁচতে চেয়েছিল নিজের মতো করে। তারাও আর আবদ্ধ ঘরে জীবন কাটাতে চায়নি। বাইরের জীবনের সাধ নিতে চেয়েছিল। এইরকম কিছু মেয়েদের জীবনকাহিনি নিয়ে দিব্যেন্দু পালিত 'মধ্যরাত' উপন্যাসের বয়ন করেছেন।

এই উপন্যাসের মূল চরিত্র তপতী। সে সুরমাদেবী গার্লস কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপিকা। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে তার কাকার বাড়ি থেকে মেসবাড়ির যাত্রায়। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর কাকার বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল তাকে। কাকা ভালো ব্যবহার করলেও কাকিমা আটাশ-ঊনত্রিশ বছরের ধিঙ্গি আইবুড়ো মেয়েকে সুনজরে দেখেনি। শেষে অশান্তির ভয়ে তপতী 'নষ্টনীড়' নামক মেসবাড়িটিতে আশ্রয় নেয়। মেসবাড়িতে এসে তার জীবন ভালোই কাটছিল। বাকি মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা, গল্পগুজব, মজলিশ, হাসিঠাট্টা আর সর্বোপরি প্রত্যেকের দুঃখের কাহিনি— সবাই মিলেমিশে ছিল। "গোটা বিষয়টার মধ্যে

কোথায় যেন এক ব্যঙ্গের ছোঁয়া আছে, অভিভাবকহীন স্বাধীন কয়েকটি মেয়ের আত্মপরিচয়ের রূপান্তর"[১১] — এই উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন।

উপন্যাসটিতে লেখক প্রত্যেকটি মেয়ের পেশাগত পরিচয়কে তুলে ধরেছেন। সাবিত্রীর পেশা নার্সিং। রিনা চাকরি করে কুটির শিল্পের দোকানে। বাসন্তী একটা বেসরকারি অফিসে কাজ করে। এছাড়াও রত্না, মন্দিরা, মিনতি, দীপালি, অঞ্জলি, রেণু— এদের পেশা কি লেখক বলেননি ঠিকই কিন্তু এরা প্রত্যেকদিন সকালে কাজে বের হয় এবং রাত্রে মেসে ফেরে। সবার সহজ এবং আন্তরিক ব্যবহারে প্রত্যেকের দিন ভালোই কাটছিল। কিন্তু কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটায় প্রত্যেকে বিমর্ষ হয়ে পড়েছে। সাবিত্রীর রহস্যময় গতিবিধি, হঠাৎ নীলার বিয়ে হয়ে যাওয়া, অঞ্জলির আকস্মিক অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়া ও লুকিয়ে গর্ভপাত করাতে গিয়ে মৃত্যু, সেই ঘটনা খবরের কাগজে হাইলাইট হওয়া, মেসবাড়িতে পুলিস আসা— ইত্যাদি ঘটনায় প্রত্যেকে ক্লান্ত, বিষণ্ণ এবং ভয়াতুর হয়ে পড়েছে। তারা ঠিক করেছিল সবাই নিজের নিজের বাড়িতে গিয়ে থাকবে। কিন্তু যে যেখানে গেছে কেউ ভালোভাবে থাকতে পারেনি। সবসময় অনুভব করেছে শূন্যতা, একাকীত্বতা। ফলে কয়েক মাস পর তারা আবার নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে ফিরে আসে 'নষ্টনীড়ে'। এবারে কিছু নতুন মেয়ে মেসবাড়িতে আসে। এভাবেই শেষ হয় উপন্যাসটি।

দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন বিষয়ক দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাস 'প্রণয়চিহ্ন'। উপন্যাসটি অরুণা প্রকাশনী থেকে ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হয়। তিনি উপন্যাসটি উৎসর্গ করেন সাহিত্যিক বিমল করকে। উত্তম পুরুষে উপন্যাসটি রচিত। কথক নায়িকা নমিতা। তার আত্মকাহিনি উপন্যাসটির বিষয়বস্তু। দাম্পত্য জীবনের কলহে ঘর-সংসার ছেড়ে তার একাকীত্ব জীবন কীভাবে কেটেছিল তাই লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। নারী ও পুরুষের বহুগামিতার প্রসঙ্গ এসেছে। পুরুষ যেমন অন্য নারীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছে, নারীও তেমনি বহু পুরুষের সান্নিধ্যে স্বেচ্ছায় এসেছে। দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে নারী-পুরুষের এই অবৈধ সম্পর্কের বিন্যাস পরবর্তী বহু উপন্যাসে দেখা যায়।

ব্যবসায় উন্নতির ফলে মহীতোষ তার স্ত্রী নমিতাকে নিয়ে একান্নবর্তী পরিবার থেকে ফ্ল্যাটে চলে আসে। ব্যবসার জগতে সে স্ত্রীকে সামাজিক হতে চেষ্টা করে। ফলে নমিতাকে চা-কফির বদলে বিলিতি কায়দায় মদও ঢেলে দিতে হতো। নমিতাকে অন্য পুরুষের সঙ্গে

বাইরেও যেতে হতো। মিশতে হতো তাদের আড্ডায়, পার্টিতে। যে মহীতোষ একদিন তাকে ঘর-সংসার থেকে দূরে ব্যবসার জগতে নিয়ে আসে সে'ই হঠাৎ করে সন্দেহ করে তাকে। নমিতার কথায়—

> "মহীতোষ তার ব্যবসার সুবিধের জন্য মক্কেল ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করাতে চাইত আমাকে।...কিন্তু এর জন্য যে স্বতঃস্ফূর্ততা দরকার, যে মানসিক ঔদার্যতা— নাগালের বাইরে স্বত্ব অধিকার করার জন্য ভেতরের স্বত্ব কিছুটা ছাড়া, মহীতোষের তা ছিল না। ব্যাপারটা কোনোদিনই সে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি।...বুঝিনি পর্দার বাইরে টেনে আনলেও পর্দাটাকে ছিঁড়ে ফেলতে পারেনি মহীতোষ।"[১২]

নমিতার ভুল ছিল। সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই জেনেও কোনো প্রতিবাদ করেনি। সে মানসিক ঔদার্যহীন, দুর্বল, স্পর্শকাতর, সন্দেহগ্রস্ত স্বামীকে সবল হবার সুযোগ দিয়েছিল। মহীতোষের চোখে ব্যভিচারিণী হয়ে যায় নমিতা। এই অভিযোগে কোর্টের দ্বারস্থ হয় নমিতা। আইনি মাধ্যমে ছয় বছরের দাম্পত্য সম্পর্ক ভেঙে যায় নিমেষে। কিন্তু আইন তাকে এক ধরনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলেও স্বাধীনতা দেয়নি। দেয়নি আত্মরক্ষার অধিকার। সমাজের চোখে সে খারাপ হয়ে যায়। লোকে তাকে অবাঞ্ছিত মনে করেছে। সামান্য ফ্ল্যাট খুঁজতে গিয়ে ডিভোর্সির কথা শুনে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে অনেকে। নমিতা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। দেবর পরিতোষের কথা তার মনে পড়ে যায়—

> "বউদি জেদ থাকা ভালো, যদি শেষপর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে পারো। তুমি কি পারবে! বরং তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো।"[১৩]

মহীতোষের সন্দেহই জোর এনে দিয়েছিল তাকে। পরিতোষের সাহায্যে একটা ফ্লাটে ভাড়া পায়। শুধু বাঁচার জন্যই তার এই আশ্রয়—

> "বাঁচতে আমার বড়ো লোভ হয়, ইচ্ছে করে আর অনেক, অনেকদিন ধরে বাঁচি। সময়ের ভার অসহ্য না হলে, ...সত্যিই আমি আরও অনেকদিন বেঁচে যাবো।"[১৪]

কাকার বন্ধু মিস্টার সরকারের সুপারিশে নমিতা মার্কেন্টাইল ফার্মে রিসেপশনিস্টের কাজ পায়। এছাড়াও অফিসকর্মী সুব্রত মডেলের কাজ দেয় তাকে। কিন্তু জীবিকার সন্ধান পেলেও জীবন বদলায় না তার। একাকীত্ব কাটাতে পুরুষের দরকার হয়। নির্জন ফ্ল্যাটে নিত্য যাতায়াত চলে বন্ধু মনীশের। মনীশ বিবাহিত। স্বাভাবিকভাবেই নতুন করে ঘর-সংসার করার স্বপ্ন বৃথা। মহীতোষও দ্বিতীয় বিয়ে করেছে। এভাবেই নমিতা আর মহীতোষের প্রণয়চিহ্নগুলি ক্রমে ক্রমে পাল্টে গেছে।

খ. দ্বিতীয় পর্ব ['সন্ধিক্ষণ' (১৯৭১) থেকে 'সবুজ গন্ধ' (১৯৮২)] :

এই পর্বের উপন্যাসগুলি হলো— 'সন্ধিক্ষণ' (১৯৭১), 'সম্পর্ক' (১৯৭২), 'আমরা' (১৯৭৩), 'বৃষ্টির পরে' (১৯৭৪), 'বিনিদ্র' (১৯৭৬), 'চরিত্র' (১৯৭৬), 'একা' (১৯৭৭), 'উড়োচিঠি' (১৯৭৮), 'অহংকার' (১৯৭৯) এবং 'সবুজ গন্ধ' (১৯৮২)।

দিব্যেন্দু পালিতের বেশকিছু উপন্যাসে শূন্যতা, একাকীত্ব এবং বিষণ্ণতার অনুষঙ্গে মৃত্যুবোধ মূল সুর হয়ে উঠেছে। 'সন্ধিক্ষণ' (১৯৭১), 'বৃষ্টির পরে' (১৯৭৪), 'একা' (১৯৭৭), 'সবুজ গন্ধ' (১৯৮২) প্রভৃতি উপন্যাসে মৃত্যুবোধ আগাগোড়া সঞ্চারিত হয়েছে। এই উপন্যাসগুলিতে মৃত্যুর অমোঘ আবির্ভাব কখনো জীবনকে চিনিয়ে দেয়, কখনো সম্পর্কগুলিকে উল্টেপাল্টে সাজিয়ে দেয় নতুন করে, কিংবা কখনো অবিন্যস্তই রেখে দেয়।

'সন্ধিক্ষণ' দিব্যেন্দু পালিতের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম উপন্যাস। এই সময় লেখকের লেখার হাত যথেষ্ট পাকা। আগের উপন্যাসগুলির মতো কাহিনির বাড়াবাড়ি নেই। উপন্যাসগুলিও আকারে ছোটো হয়ে এসেছে। ছোটোগল্পের মতো উপন্যাসের শুরুতেই একটা চমক আছে। যেমন—

> "ভোরের দিকে চলে গেল কনক। কাকপক্ষী জেগে ওঠার আগে, উদাসীন হাওয়া আর রহস্যময় আলোছায়ার মধ্যে, এক ঘুম থেকে আরেক ঘুমে ঢলে পড়ার মতো— নিঃশব্দে চলে গেল।"[১৫]

উপন্যাসের শুরুতেই এইভাবে একটা মৃত্যুর প্রসঙ্গ পাঠককেও একা করে দেয়। প্রিয়জনকে হারাবার শূন্যতা পাঠককেও বিষণ্ণ করে তোলে। কনকের চলে যাওয়াটা ছিল অবধারিত। শুধু দিনক্ষণটি জানা ছিল না কারোর। দিনক্ষণ জানা হয়ে গেলে কনকের পিতা

দাশরথি নিঃশব্দে একটি প্রশ্ন করে 'কখন'? তার মা বসুধা মূক হয়ে যায়। বড়ো বোন বুলা অসহায় সংসারের জন্য চাকরি খোঁজে। ছোটো বোন ঝুমির কৌমার্য নষ্ট হয় কনকের বন্ধু শ্যামলের হাতে। বন্ধু অমিয়, নিখিল অতীতের হারানো স্মৃতিতে জীবনের মানে ভুলে যায়। সর্বোপরি অমিয় আর রেখার দাম্পত্য সম্পর্কে ফাটল ধরে।

নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে দাশরথি কেরানীর চাকরি করলেও কনকই ছিল একমাত্র ভালো উপার্জনশীল। কনকের মারা যাওয়াটা ছিল পরিবারের ওপর এক অশুভ শক্তির অভিশাপ। দাশরথির প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের যেটুকু টাকা ছিল কনকের চিকিৎসায় শেষ হয়ে যায়। ছেলের শ্রাদ্ধ করার কানাকড়িও প্রায় ছিল না। ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধশান্তির বিদায় দেওয়ার টাকাটাও দিতে পারেনি। নিত্য দারিদ্র্য নেমে আসে পরিবারে। দুই মেয়ের বিয়ের বয়স পার হয়ে যাচ্ছে ভেবে দিশেহারা হয়ে পড়ে। এইজন্য কনকের অসুখটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেলেও হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাননি দাশরথি। তিনি বলেছিলেন—

> "কেরানী মানুষের সম্বল তো ওই প্রভিডেন্ট ফাণ্ডটি, ওতে হাত দেবো! আমার তো শুধু একটি নিয়ে ভাবলেই চলে না!"[১৬]

নিত্য দারিদ্র্যের বেড়াজালে বুলা অসহায়ভাবে ঘরের বাইরে এসেছে চাকরির জন্য। দাদার অফিসে চাকরি খুঁজতে গিয়ে হেনস্থা হতে হয়েছে তাকে। দাদার বন্ধু নিখিলের শরণাপন্ন হলে নিখিল তাকে গুরুত্ব দেয়নি। বরং তার অফিসে গেলে সে অস্বস্তিবোধ করেছে। চাকরির জন্য হয়রান হওয়া বুলার মনে হয়েছে, তার কাছ থেকে সবাই আলাদা, বিচ্ছিন্ন, অবিন্যস্ত হয়ে পড়েছে। বুলা বেকারত্বের জ্বালায় ভিতরে ভিতরে নিঃশব্দে ক্ষয়ে যাচ্ছে। নিজের ভাবনার মধ্যে টুকরো টুকরো হয়ে পড়েছে।

কনকের মৃত্যুর পর ছোটো বোন ঝুমি নিজের ব্যবস্থা নিজেই ঠিক করে নিতে চেয়েছে। দাদার বন্ধু শ্যামলের সঙ্গে ঘর করতে চেয়েছে। তার উপর নির্ভর করে স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু শ্যামল তার ভালোবাসার মর্যাদা দেয়নি। বুলার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে গেছে, তারপর হোটেলে নিয়ে গেছে, আবদ্ধ ঘরে তার কৌমার্য নষ্ট করেছে। স্বার্থপর শ্যামল শেষে তাকে পরিত্যাগ করেছে। পুরুষের কাছে ব্যবহৃত, পরিত্যক্ত বুলা এরপর পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেছে।

কনকের মৃত্যুতে অমিয় আর রেখার দাম্পত্য সম্পর্কে টানাপোড়েন দেখা দিয়েছে। কনক এক সময় ভালোবাসতো রেখাকে। এই সূত্রে কনকের মৃত্যুর পর রেখার মনের মধ্যে নীরবতা দেখতে পেলে অমিয় রেখাকে সন্দেহ করেছে। রেখার গর্ভের সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে অমিয়। ফলে দুজনের মধ্যে চলে নিরন্তর চাপা মনোমালিন্য ও অশান্তি। রেখা ও অমিয় পরস্পরের থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। রেখা আত্মহত্যার মধ্যদিয়ে মুক্তির পথ খুঁজতে চেয়েছিল। কিন্তু স্বামীর প্রতি ভক্তি আর সন্তানের কথা ভেবে পারেনি। এইভাবে কনকের মৃত্যুর পর সময়ের এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে প্রত্যেকেই অসুস্থতা ও নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করে।

'বৃষ্টির পরে' উপন্যাসের শুরুতেও মৃত্যুর প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু সেই মৃত্যুটি অমানবিক, অসামাজিক। একটি সাত বছরের শিশু কন্যাকে ধর্ষণ ও খুন করে করে নদীতে ফেলে দিয়েছে। এই ঘটনার পর মেয়েটির বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী কেউই স্বাভাবিক থাকতে পারেনি। সকলেই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

কল্যাণ আর বাণীর ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে টুসি। কথা বলতো বড়ো বড়ো করে। পাড়ায় সকলের প্রিয় এবং আদরের জন্য সবসময় চোখে চোখে থাকতো। একসময়ের বিশ্বস্ত কাজের লোক শঙ্করলাল টুসিকে ধর্ষণ ও খুন করে পালিয়েছে। শঙ্করলাল ধরা পড়লেও তার শাস্তির কথা উপন্যাসে নেই। তার চেয়ে এইরকম পরিস্থিতিতে চরিত্রগুলির বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থাকে লেখক তুলে ধরেছেন।

কল্যাণ আর বাণী খুবই সহজ সরল স্বভাবের মানুষ। টুসি জন্মাবার পর তাদের দুঃখ বলে পৃথিবীতে কিছু ছিল না। পেশায় অধ্যাপক দুজনেই। বাণী একটু গম্ভীর প্রকৃতির হলেও ফাঁকা সময়ে সবার সাথে গল্প, আড্ডা, হাসাহাসি করে। কিন্তু একমাত্র মেয়েকে হারানোর পর সে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ে। ঘুমের ওষুধ খেয়ে রাতে তার এখন ঘুম আসে। মধ্যরাতে ঘুম ভাঙলে কান্নায় ভেঙে পড়ে। সব সময় তার মনে পড়ে মেয়ের মুখ, মেয়ের অনুভূতি। এই দুর্ঘটনা ভুলতে স্বামীর সঙ্গে অন্য জায়গায় চলে যেতে চায়। কল্যাণেরও একইরকম অবস্থা। মধ্যরাতের নিঃশব্দতার মধ্যে বাণীর নিঃশ্বাসই তার একমাত্র নির্ভরতা। নেশায় অভ্যস্ত না হলেও এই সময় সিগারেট ধরায়। তার মনে হয়েছে জীবন অসহ্য— দুঃখের

অতীত স্মৃতি থেকে পরিত্রাণ পেতে সে স্ত্রীকে নিয়ে অন্য বাসস্থানে গেছে। যাবার সময় অশোককে তারা বলে গেছে, "শুধু একজন থেকে গেল— তুই দেখিস— "[১৭]

এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অশোক। সে গ্রামের ছেলে হলেও চাকরির সূত্রে কলকাতায় থাকে। কলকাতায় তার আত্মীয়-স্বজন বলতে কেউ নেই। কল্যাণদের পাড়াতেই থাকে। তার চোখ দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন, মৃত্যু মানুষকে কীভাবে সমাজজীবন থেকে দ্রুত একা করে দেয়। রাত্রে বিছানায় শুয়ে অশোক শুনতে পায় অন্ধকারে নিঝুম হচ্ছে শহরটা। তার ভয় হয়, একদিন হয়তো সবকিছু থেমে যাবে। আদ্যন্ত বিষাদে ডুবে যায় টুসির মৃত্যুর কথা ভেবে, নির্জন রাতে গুণ্ডাদের আক্রমণে মাস্টার মশাইয়ের মাথা ফাটার কথা ভেবে, ধর্মান্তরিত একটি মেয়ের চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাওয়া কথা ভেবে, পায়ে আঘাত নিয়ে একটি ছেলে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে তার স্বপ্ন থেকে তার কথা ভেবে। অনেক মুখের কথা তার মনে পড়ে। রাজবালা, শ্যামশ্রী, গায়ত্রী, বিষাণের বিষাদ ভরা মুখ। তার মনে হয়েছে—

> "জীবন জড়িয়ে যাচ্ছে জীবনের সঙ্গে; এই শহরের ভাঙাচোরা, বিবর্ণ অস্তিত্বের মধ্যে থেকে এখন সে কোথায় আলাদা করে খুঁজে পাবে নিজেকে!"[১৮]

'একা' (১৯৭৭) উপন্যাসের শুরুতে শ্রীলা আত্মহত্যা করেছে। স্বামী, সন্তান থাকা সত্ত্বেও কেন সে আত্মহত্যা করেছিল তার সঠিক কারণ জানা যায় না। তার মৃত্যুটা শিশিরের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। শিশিরের মনে হয়েছিল, শ্রীলার আত্মহত্যা পরোক্ষে তার দিকেই আঙুল তুলেছে। যদিও আত্মহত্যার আগে স্পষ্ট লিখে গিয়েছিল শ্রীলা— 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়— '। স্ত্রীর আত্মহত্যার পর ব্যক্তিজীবনের নিঃসঙ্গতা এবং অতীত স্মৃতির বেদনায় শিশিরের দ্বন্দ্বময় জীবন লেখক উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন।

দশ বছরের দাম্পত্য জীবনে স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে শিশির সুখেই ছিল। সে একটু অহংকারী ছিল। অফিসে সুনামের দম্ভে তার পা মাটিতে পড়ে না। চার বছরে পাঁচটি বড়ো ধাপ সে ছাড়া আর কেউই পেরিয়ে আসতে পারেনি। সবসময় স্ট্যাটাস মেইনটেন করে চলত। অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে সে স্ত্রী ও সন্তানকে সময় দিতে পারতো না। তার স্ত্রীর শুধু একটাই অভিযোগ ছিল, সে কোনোদিন তাকে বুঝতে পারেনি। স্ত্রীর মৃত্যুর

পর শিশির একা হয়ে যায়। বিষণ্ণতা ঘিরে ধরে চতুর্দিকে। নিঃশব্দে কাটে তার এক একটা দিন। অনুভূতি জুড়ে এক ধরনের অসহায়তা টের পায় সে—

> "একটা শুকনো অনুভূতি ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল তাকে। এরপর ক্রমশ অসুখী হবার দিকে এগিয়ে যাবে সে? নাকি শ্রীলার অভাবে অসহ্য হয়ে উঠবে জীবন?"[১৯]

একমাত্র সন্তানকে রেখে আসে শ্বশুরবাড়িতে। স্ত্রী না থাকার অবসাদ কাটিয়ে সে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করে। বাঁচতে ভালো লাগে তার। সে বাঁচতে চায় অফিস নিয়ে, কেরিয়ার নিয়ে, সাফল্য আর সচ্ছলতা নিয়ে, চন্দনের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। নিজের মনকে বোঝাতে চায়— "শ্রীলার মৃত্যু একটা ঘটনামাত্র— যেমন অন্যান্য ঘটনা, তা হলে সে থেমে আছে কেন!"[২০] মুহূর্তের অবসাদ কাটিয়ে অনেকটা সুস্থতা অনুভব করে।

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে চরিত্ররা অতীত স্মৃতির যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়নি। স্মৃতি মাঝে মাঝে শিকড় ধরে টান দিয়েছে। নিজের জীবন পরিবর্তন করতে পারেনি শিশির। পরিষ্কার বুঝতে পারে, মৃত্যুর বর্ণনা ছাড়া আর কোনো চিহ্ন নেই পরিবর্তনের। একটা অপরাধবোধ, একটা অস্বস্তি এসে বারবার এলোমেলো করে দিয়েছে তার মনকে। প্রতিদিনের অভ্যাস থেকে সরে আসতে চেয়েছিল সে। লিজ, কণার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে মুক্তি পেলেও একাকীত্ব তার পিছন ছাড়েনি। মেয়েদের শরীরে মুগ্ধ হতে পেরেছে, কিন্তু দুঃখে পারেনি। তার মনে হয়েছে—

> "কেন মনে হচ্ছে জীবন যেমন ছিল আর ঠিক তেমন থাকবে না— শরীর থেকে ক্রমশ কমে যাবে হাত-পায়ের জোর, মন থেকে দাপট, স্মৃতিবিজড়িত বিস্মৃতির দিকে ক্রমশ হাঁটতে হবে একা!"[২১]

নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করতে অনেক চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। বিবেকের কাছে হেরে যায়। সন্তানের ঘৃণার কথা ভেবে আঁতকে ওঠে। 'মানুষ সব পারে কিন্তু সন্তানের ঘৃণা সহ্য করতে পারে না'।[২২] শিশির অপরাধবোধের যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য ছটফট করতে থাকে। মৃত স্ত্রীকে উপলক্ষ করে বলে—

"দ্যাখো, কেমন সুন্দরভাবে কেটে যাচ্ছে এক-একটা দিন! কী মধুর নিঃস্বতায় মিশে যাচ্ছে নিঃশ্বাস, স্মৃতি মিশে যাচ্ছে স্মৃতিতে। কাল যেখানে ছিলাম, আজ ঠিক সেখানে নেই। ঘাস মাটি নির্জনতার গন্ধে ভরা এই অন্ধকারে চুপিসারে আরো একটু এগিয়ে যাব কাল— "[২৩]

'সবুজ গন্ধ' (১৯৮২) উপন্যাসের আবহেও আছে মৃত্যুর প্রসঙ্গ। এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে মানসী নার্সিং হোমের কেবিনে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তাকে কেন্দ্র করে তার স্বামী দীপঙ্কর, বাবা-মা, এবং বোন তাপসীর মধ্যে এক জটিল ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয়েছে। মৃত্যুর ধূসর গন্ধের মধ্যে কেউই স্বাভাবিক থাকতে পারেনি। উপন্যাসটিতে কোনো কাহিনি নেই। চরিত্রগুলোর দোলাচলতা, মানসিক দ্বন্দ্ব, নিঃসঙ্গতা, নিজেদের অপরাধবোধ লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন।

বাবা-মার অমতে মানসী রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেছিল দীপঙ্করের সঙ্গে। কয়েকদিন পর মানসী এক জটিল রোগ নিয়ে নার্সিং হোমে ভর্তি হয়। ডাক্তারের রিপোর্ট শুনে দীপঙ্কর বুঝতে পারে মানসী ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে। অসুখ মানুষকে কতো দূরত্বে ঠেলে দেয়, একা করে তোলে, দীপঙ্কর রক্তের প্রবাহে প্রবাহে তা টের পায়।

"মানসীর অসুখটা একা করে দিয়েছে তাকে— এতো একা যে নিজের মধ্যে ক্রমশ আরও একা হতে হতে সে ভুলে যাচ্ছে তার চারপাশ, মানুষজন ও পরিবেশের অস্তিত্ব!"[২৪]

একসময় মানসীর ভালোবাসার স্পর্শে আবিষ্ট হয়ে থাকত দীপঙ্কর। মানসীকে সঙ্গে নিয়ে পাশাপাশি হাঁটলে একরকম গন্ধ পেতো সে। বৃষ্টিভেজা সবুজের আর্দ্রতা মেশানো, অল্প আরকের ছোঁয়া লাগা কিংবা হঠাৎ উড়ে আসা ভোরবেলার হাওয়ার স্নিগ্ধতা ও রহস্যময়তা মানসী চিনিয়েছিল তাকে। সেই কারণেই সবুজ গন্ধের আকর্ষণ তার কাছে ছিল অত্যন্ত প্রিয়। কিন্তু মানসীর অসুস্থতা আর হাসপাতালের স্প্রে করা কৃত্রিম গন্ধের মধ্যে সবুজ গন্ধের মাধুর্যতা হারিয়ে যায়। মানসীর সমগ্র শরীরে ঘ্রাণের ইন্দ্রিয় পরিস্ফুট করে তুললেও সেই বিচিত্র গন্ধ আর পায় না দীপঙ্কর। তখন তার নিশ্বাস এলোমেলো হয়ে যায়। হারিয়ে ফেলে মানসিক ভারসাম্য।

অনেকটা অভ্যাসবশত স্ত্রীর এরকম অবস্থাতেও সে অফিসে যায়, সময় মতো হাসপাতালে যায়। মৃত্যুর মুখে পতিত স্ত্রীর সঙ্গে সময় কাটায়। মানসীর রক্তহীন আঙুল, ফ্যাকাসে ঠোঁট দেখে বুঝতে পারে শুধু সময়ের অপেক্ষা। তারপর সে একা হয়ে যাবে। নিঃসঙ্গ জীবন কাটাবে। এসব ভাবতে ভাবতে একার ভার দ্বিগুণ হয়ে চেপে বসে তার বুকে। সময় ও দূরত্ব ক্রমশ সৃষ্টি করে আরো বেশি প্রতিবন্ধকতা। কমে আসে তার নিঃশ্বাসের জোর। দূরত্ব কমানোর জন্য মাঝে মাঝে সময়ের আগেই ছুটে আসে হাসপাতালে। কিন্তু মৃত্যুর কাছে সবই হার মানে।

হাসপাতালের আবদ্ধ পরিবেশে থেকে থেকে মানসী নিজের অসুস্থতা ও দীপঙ্করের একটু একটু করে বদলে যাওয়া বুঝতে পেরেছিল। তার শরীর চলে না বলে ভালোবাসার আবেগ দীপঙ্করের কমে গেছে। সে অভিযোগ করে, যার স্ত্রীর এরকম যায়-যায় অবস্থা সে কীভাবে অফিস করে। মানসী সন্দেহ করে দীপঙ্করকে। বিয়েটা সামাজিক মতে হয়নি বলে কি দীপঙ্করের সে পুরোপুরি স্ত্রী নয়। সে শুধু একটু সঙ্গ চায় দীপঙ্করের কাছে। বাঁচার তীব্র ইচ্ছা ছিল মানসীর। পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধে সে নিজেকে আবার নতুন করে সাজিয়ে তুলতে চায়। সুস্থ হয়ে সামাজিক নিয়ম মেনে বিয়ে করবে দীপঙ্করকে। তাই সবুজ পাড়ের শাড়ি পড়ে দীপঙ্করের কাছে নিজেকে আরো সুন্দর করে মেলে ধরতে চায়। শরীরে শক্তি এনে বলে—

> "দীপু তুমি বুড়ো হয়ে যেও না। মনটা ভালো রেখো। মাঝখানের সময়টাকে আমরা বাদ দিয়ে দেব। যেদিন আমাকে ফেরত নিতে আসবে, সেদিন তোমার আজকের বয়সটাকেই সঙ্গে করে এনো। মানুষ তো কিছুর জন্যে বাঁচে, আমি তোমার জন্যেই বেঁচে উঠব!"[২৫]

কমলাকান্ত একদিন আফিমের মাত্রা চাড়িয়ে দেখেছিলেন, 'এই বিশ্বসংসার একটি বড়োবাজার— সকলেই সেখানে আপনাপন দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে। সকলেরই উদ্দেশ্য মূল্যপ্রাপ্তি।...সেই অসংখ্য দোকানদারে অসংখ্য খরিদ্দারে পরস্পরকে অসংখ্য অঙ্গুষ্ঠ দেখাইতেছে'।[২৬] একুশ শতকেও এই পরিস্থিতির কোনোরকম পরিবর্তন হয়নি। দিব্যেন্দু পালিত তাঁর উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের এই স্বপ্নকল্পনাটি আত্মস্থ করেছিলেন।

'সম্পর্ক' (১৯৭২), 'বিনিদ্র' (১৯৭৬), 'ঢেউ' (১৯৮৭), 'সিনেমায় যেমন হয়' (১৯৯০) প্রভৃতি উপন্যাসে দিব্যেন্দু পালিত বিজ্ঞাপন ও বিপণন সংক্রান্ত বহু বিষয় তুলে ধরেছেন। আসলে উপন্যাসে এই প্রয়োগ ছিল তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফল। কর্মসূত্রে ১৯৬৫ সালে তিনি যোগ দেন বিপণন ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত পেশায়। সেইসূত্রে দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন অ্যাডার্টস অ্যাডভার্টাইজিং এবং পরে ক্লারিয়ন-ম্যাকান, আনন্দবাজার সংস্থা, দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকার সঙ্গে। সেই সঙ্গে আজকাল, যুগান্তর, অমৃতবাজার পত্রিকাতেও। ১৯৮৭ সালে আনন্দবাজার পত্রিকার সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর রূপেও কাজ করেছিলেন। ২০০০ সাল পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন সংবাদ পত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বলা যায় সম্পূর্ণ জীবনটাই তিনি সংবাদপত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি স্মৃতিচারণায় বলেছেন—

> "সাধারণের কাছে অপরিচিত এই নতুন জগৎ ও মানুষজন তাদের দ্বন্দ্ববহুল অস্তিত্বের টানাপোড়েন নিয়ে বিপুলভাবে স্পর্শ করেছে আমাকেও, 'সম্পর্ক,' ও 'বিনিদ্র' উপন্যাসে তার আভাস পাওয়া যায়।"[২৭]

'সম্পর্ক' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে। লেখক উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছেন রমাপদ চৌধুরীকে। উপন্যাসটির আবহমণ্ডলে আছে বিজ্ঞাপন জগতের প্রসঙ্গ। প্রধান চরিত্র রামতনু সোম, স্টারলেট হিউমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। সে ঐ সময়কার বিজ্ঞাপন জগতের সেরা মানুষ বলে খ্যাত। বিজ্ঞাপন জগতে তার হাতেখড়ি কপিরাইটার হিসাবে। তখন থেকে গত পঁচিশ বছর ধরে স্টাইল প্রিসিসান— এই দুই পরিপূরকের চর্চা করেছেন তিনি। বর্তমানে বিজ্ঞাপন বিষয়ে তার মনোভাব—

> "দেশ স্বাধীন হয়েছে বাইশ বছরেরও বেশি দিন, এই বিপুল সময়ের মধ্যে সর্ব বিষয়ে আমরা স্বনির্ভর হব, পথও যতো খুঁজে নেব নিজেদের মতো করে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কার্যত তা হয়নি। অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতোই বিজ্ঞাপন-চিন্তায় আমরা এখনো মাত্রাতিরিক্ত পরাশ্রয়ী, বিদেশী ভাবনায় অনুপ্রাণিত।"[২৮]

কোম্পানির কাজের জন্য তাকে প্রতিদিন ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি প্রভৃতি পাঁচ-সাতটি খবরের কাগজ দেখতে হয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। বিশেষ করে স্টারলেট হিউমের রিলিজগুলো। রিপ্রোডাকসনের কোনো গণ্ডগোল দেখলেই লাল পেনসিল দিয়ে দাগিয়ে রাখে। সে মনে করে

অধিকাংশ লোকই বিজ্ঞাপন জগতে ঠিকঠাক কাজ করতে পারে না। বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবার পরও তারা বুঝতে পারে না, দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটের মুহূর্তে আমাদের মতো অনুন্নত দেশে বিজ্ঞাপনের চেহারা কী রকম হতে পারে। তার মতে—

> "এখনও এ-দেশের অধিকাংশ বিজ্ঞাপন পরিকল্পিত হয় মুষ্টিমেয় ইংরেজি-শিক্ষিত কেতাবি ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে, যাঁরা সাহেবদের অনুকরণে ওঠেন, বসেন এবং নিদ্রা যান। সেই কোটি কোটি বিভিন্ন জনসাধারণের কথা ভুলে থাকি আমরা, চলায় বলায় মানসিক গঠনে যাঁরা পুরোদস্তুর ভারতীয়।"[২৯]

স্বাধীনতার অল্প কয়েকদিন পরে ফিডার লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়। ছোটোখাটো যে কয়েকটি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দেখাশুনার সূত্রে স্টারলেট অ্যাডভার্টাইজিংয়ের পথ চলা শুরু হয়েছিল, ফিডার ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম। বর্তমানে তারা বেবি ফুড তৈরীর এক বিলিতি ফর্মুলা আমদানি করে নতুন পরিকল্পনায় হাত দিয়েছে। রামতনু জানত ফিডাররা ভারতবর্ষে এর হৈচৈ তোলার জন্য প্রচুর বিজ্ঞাপন দেবে। ঐ বিজ্ঞাপনের বরাদ্দের টাকা (কুড়ি লক্ষ) রামতনু যে কোনো উপায়ে পেতে তৎপর। প্রথমদিকে রামতনুর বিশ্বাস ছিল দীর্ঘদিনের সম্পর্কের কারণে 'বনিবেব্'–এর অ্যাকাউন্টটা পেতে স্টারলেট হিউমেই আসবে। কিন্তু স্টারলেট হিউমের দিল্লি ব্রাঞ্চের ম্যানেজার বুধি নায়ার জানান, 'বনিবেব্'-এর অ্যাকাউন্টটা নতুন কোম্পানি ইউরেকার সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছে। ফলে তাদের পাওয়ার সুযোগ কম। এরকম হলে রামতনুর মান-সম্মানে লাগবে। তাদের কোম্পানি পিছনে পড়ে যাবে। আর একটি ব্যর্থতাই ভবিষ্যতে আরো অনেক ব্যর্থতা এনে দেবে। এই ভেবে রামতনুর মনে জেদ চেপে যায়, যে রকম করেই হোক 'বনিবেব্'-এর অ্যাকাউন্ট সে হাতছাড়া করবে না।

রামতনু সোম অসাধারণ বুদ্ধিমান ও ধীশক্তিসম্পন্ন। তার নানা গুণের মধ্যে একটি অসামান্য আত্মবিশ্বাস। সে 'বনিবেব্'-এর অ্যাকাউন্ট পেতে দিল্লিতে ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে যায়। সেখানে কোনো বন্দোবস্ত না হওয়ায়, ম্যানেজার বুধি নায়ারের সঙ্গে প্ল্যান করে। তারা অফিসকর্মী নীরাকে কাজে লাগায়। চাকরিতে ঢুকে অল্পদিনের মাথায় নীরাও নিজের বেতন ও পদোন্নতির জন্য সবকিছু করতে রাজি হয়। কিন্তু নীরা বুঝতে পারে না

তাকে ব্যবসার খাতিরে কাজে লাগায় রামতনুরা। 'আমার সময়' পত্রিকায় দিব্যেন্দু পালিত জানান—

> "এখানে (বিজ্ঞাপন জগতে) মানুষকে বিচার করা হয় পণ্য বা প্রোডাক্ট হিসেবে। এবং সেই প্রোডাক্টের চরিত্র পর্যবেক্ষণ করেই তৈরী হয় বিজ্ঞাপন।"[৩০]

ব্যবসার জগতের এটা একটা বৈশিষ্ট্য। যেখানে নারীকে প্রোডাক্ট করা হয়।

বিজ্ঞাপন জগতের প্রসঙ্গ নিয়ে দিব্যেন্দু পালিতের আর একটি উপন্যাস 'বিনিদ্র' (১৯৭৬)। উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র দীপ্ত রায়। সে কাজপাগল একজন মানুষ। বিজ্ঞাপন জগতে লড়াকু মানসিকতা নিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ ও ব্যক্তিত্ব পাকা করেছে সে। দিনরাত একাকার করে সে নিয়মিত ক্যাম্পেন প্রেজেন্টেশনের কাজ করে চলেছে। স্টারলেট হিউমের হাত থেকে কফি অ্যাকাউন্ট ছিনিয়ে নিতে সে বদ্ধ পরিকর। এদিক থেকে 'সম্পর্ক' উপন্যাসের রামতনু সোমের সে সমগোত্রীয়।

স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড গ্রীভসের নতুন ব্র্যাণ্ডের কফি বাজারে বিক্রি হয়নি। তাই কোম্পানি সেই কফি প্রায় নতুন অবস্থাতেই বাজার থেকে তুলে নেয়। দীর্ঘ ছয় মাস পর কোম্পানি সেই পুরনো কফি আবার বাজারে আনতে চায়। এর জন্য প্রচুর টাকার বিজ্ঞাপন করতে চায় কোম্পানি। সেই অ্যাকাউন্ট পাওয়ার জন্য বিজ্ঞাপন কোম্পানিগুলির মধ্যে শুরু হয় রেষারেষি। স্টারলেট হিউম, ক্রিয়েটিভ গ্রুপ, হিন্দুস্থান ফস্টার প্রভৃতি বিজ্ঞাপন সংস্থাকে ডেকেছে ক্যাম্পেন তৈরী করার জন্য। কিন্তু কে পায় সেই অ্যাকাউন্ট। বড়ো বড়ো কোম্পানিগুলির সঙ্গে বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলির গাঁটছাড়া সম্পর্ক। হিন্দুস্থান ফস্টারের দীপ্ত রায় এই অ্যাকাউন্টটি হাত ছাড়া করতে চাননি। কিন্তু অসুবিধা হলো, তাদের থেকে স্টারলেট হিউমের বিজ্ঞাপন বিষয়ে অভিজ্ঞতা, টিমওয়ার্ক ও প্রফেসনাল নলেজ অনেক বেশি। তাছাড়া ঐ কোম্পানিতে রামতনু সোম ও নির্মল সেনের মতো তুখোড় বিজ্ঞাপনবিদদের অস্তিত্ব। এইরকম একটা অ্যাকাউন্ট তারাও নিতে ভুল করবে না। দীপ্ত তবুও অ্যাকাউন্ট পেতে মরিয়া। তার কাজ সহজ হতো যদি স্টুয়ার্ট অ্যাণ্ড গ্রীভসের মার্কেটিং ডিরেক্টর অশোক মুখার্জি অসুস্থ হয়ে নার্সিং হোমে না যেত। নতুন দায়িত্ব পায় সিন্‌হা। মার্কেটিংয়ে সিন্‌হার অভিজ্ঞতা কম। বোধও অস্বচ্ছ। লোকটি স্বার্থ ছাড়া যে একটুও নড়বে না দীপ্ত ভালো করে জানে। অপরদিকে স্টারলেট হিউমের রামতনু সোম নিজে তাদের ক্যাম্পেন প্রেজেন্স করবে—

একথা শুনে দীপ্তর উদ্বেগ প্রায় শূন্য হয়ে আসে। কিন্তু দীপ্তর কাছে যে কেনো মূল্যে লক্ষ্য পূরণই আসল কথা। 'সম্পর্ক' উপন্যাসে অ্যাকাউন্ট পেতে যেমন রামতনু সোম নীরাকে ব্যবহার করেছিল, তেমনি দীপ্তও এরকম ভেবেছে। নিজের অভীষ্ট পূরণের উদ্দেশ্যে সে সুনীতাকে কাজে লাগিয়েছে। অফিসকর্মী সুনীতাকে দিয়ে সিন্‌হার কাছ থেকে মোটা টাকার কফি অ্যাকাউন্ট হস্তগত করেছে।

> "আমি তোমাকে ব্যবহার করেছি মাত্র— বঁড়শির চারের মতো; তুমি অযোগ্য বলে নয়, শুধু সিন্‌হা তোমাকে চেয়েছিল বলে! বলবে কী, স্বার্থের জন্যে নিজের স্ত্রীকেও যে ঠেলে দিতে পারে অস্বস্তিতে, নিঃসম্পর্কিতা একটি মেয়ের জন্য তার প্রাণে দয়া থাকতে পারে না; সত্য সামনে ভেবে দ্যাখো কী করবে তুমি!"[৩১]

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে সুনির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন বা মতাদর্শের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নেই। ব্যক্তিজীবনেও দিব্যেন্দু পালিত রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়াননি। তবে হ্যাঁ তিনি রাজনীতির কবলে মানুষের ভোগান্তিকে স্বীকার করেছেন, স্বার্থবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে নিজের মতবাদ পোষণ করেছেন, এমনকি নিজের জীবনের বিনিময়েও তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা প্রশাসনের স্বার্থবাদী রাজনীতির কাছে হার মানেননি। দিব্যেন্দু পালিত একজন সমাজ সচেতন নাগরিক এবং লেখক। তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররাও এর ব্যতিক্রম নয়।

যাকে দলীয় রাজনীতি বা 'পার্টি পলিটিক্স' বলে দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে তার ছায়ামাত্রও নেই। তিনি রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতির কোনো তত্ত্ব বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য নিয়েও উপন্যাস লেখেননি। তাঁর পূর্বে অনেক ঔপন্যাসিকই দলীয় রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতি নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন। যেমন, প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরে বাইরে', 'চার অধ্যায়', শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী', গোপাল হালদারের 'একদা', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' ইত্যাদি। পরবর্তী সময়ে সমরেশ বসুর 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে', 'তিন পুরুষ', মহাশ্বেতা দেবীর অনেক উপন্যাস, দেবেশ রায় প্রমুখ অনেকের উপন্যাসে কোনো না কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ বড়ো হয়ে উঠেছে। এগুলি সবই সার্থক রাজনৈতিক উপন্যাস।

দিব্যেন্দু পালিত এঁদের থেকে একদম আলাদাভাবে রাজনীতিকে উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন। তিনি কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের পরিচয় তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেননি। তাঁর রাজনীতিকে ব্যবহার করার কৌশলটা অন্যরকম। তাঁর উপন্যাসে প্রত্যক্ষ রাজনীতির প্রসঙ্গ আছে ঠিকই— কিন্তু রাজনীতির কোনো দলীয় নাম নেই।

দিব্যেন্দু পালিতের চারটি উপন্যাসে রাজনীতির প্রসঙ্গ আছে— 'আমরা' (১৯৭৩), 'উড়োচিঠি' (১৯৭৮), 'সহযোদ্ধা' (১৯৮৪) এবং 'গৃহবন্দী' (১৯৯১)। এখানে একটি কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে দিব্যেন্দু পালিতের লেখক সত্তা বা উপন্যাসের মূল প্রেক্ষাপট গড়ে উঠেছিল ছয়-সাত-আটের দশকে। মূলত এই সময়কার রাজনীতির প্রসঙ্গই তাঁর উপন্যাসে মূল প্রেরণা হয়ে উঠেছে। খুব সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখলে নকশালবাড়ি আন্দোলনই তাঁর এই কয়েকটি উপন্যাসের মূল ভিত্তি। এই রাজনৈতিক আন্দোলনটিই তিনি মনে হয় খুব কাছ থেকে সচেতনভাবে দেখেছেন। বলা যেতে পারে অন্য আর কোনো রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে নয়, সাতের দশকে তরুণ-তরুণীদের মনে নকশালবাড়ি আন্দোলন যে কী ভয়াবহ অস্থিরতা, বিপন্নতা, অস্তিত্বহীনতা এনেছিল তাই বড়ো করে দেখিয়েছেন তিনি।

'আমরা' দিব্যেন্দু পালিতের প্রথম রাজনৈতিক উপন্যাস। উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৯৭৩ সাল অর্থাৎ সাত-আটের দশকের সেই রক্ত ঝরানোর দিন, নকশাল আন্দোলনের সময়। কিন্তু উপন্যাসটির সময় লেখক উপন্যাসের শুরুতেই বলে দিয়েছেন— ১৯৬৭ সাল, অর্থাৎ তখনো নকশাল আন্দোলনের ভয়াবহতা দেখা দেয়নি। পশ্চিমবাংলায় প্রথম তখন বামফ্রন্ট সরকার খুঁটি গেঁড়ে বসতে যাচ্ছে। নির্বাচনের ফলাফল গণনা চলছে। লোকে লেটেস্ট রেজাল্ট জানবার জন্য ভিড় করছে। আর মাঝে মাঝে ধ্বনি উঠছে 'যুক্তফ্রন্ট জিন্দাবাদ'। পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেসকে হারিয়ে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার কুড়ি বছর পর দ্বিখণ্ডিত বাংলার মানুষ কংগ্রেসের মন্ত্রীসভাকে ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে। এই রাজনৈতিক গুরুত্বটি অন্ততপক্ষে এই উপন্যাসের ক্ষেত্রে স্মরণ করা উচিত।

কিন্তু রাজনীতির এই পালাবদল 'আমরা' উপন্যাসের নায়ক প্রিয়নাথের মনে কোনো সাড়া ফেলেনি। সে তার অর্ধচেতন, অসাড় মন নিয়ে নিজের মনোবৃত্তে ঘুরপাক খায়। চারশো সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সার চাকরি জীবনে প্রিয়নাথ তনুশ্রী নামে একটি মেয়ের প্রেমে আবদ্ধ

হয়, কিন্তু বিয়ে করতে পারে না। সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির চাপে সবকিছুই মনে হয় আবেগহীন ও বেদনাহীন। ভোগ ও ভোগহীনতার মধ্যে কোনোটিরই যেন কোথাও সদর্থক দিক নেই। অন্য নারীর সংসর্গের সময়েও তার অন্তর্দেশ উত্তেজিত হয় না। দিব্যেন্দু পালিতের প্রায় সব উপন্যাসের মতোই এই উপন্যাসটিও একক মানুষের অস্তিত্বহীনতার আখ্যান। লেখক দেখাতে চেয়েছেন স্বাধীনতার কুড়ি বছর পর একটি রাজনৈতিক ক্ষমতার হ্রাস এবং নতুন একটি রাজনৈতিক বাতাবরণে নাগরিকদের মনে কি রকম সচেতনতা এলো। কিন্তু প্রিয়নাথের নির্জীব নির্বিকারত্বের কোনো পরিবর্তন হয় না।

উপন্যাসটিতে একটি রাজনৈতিক মিছিলের বর্ণনা আছে— "আমি দাঁড়িয়ে আছি একা, মিটিং চলছে পুরোদমে, একজন খুব উঁচুতে উঠে চেঁচিয়ে যাচ্ছে : এ-সংগ্রাম বাঁচার সংগ্রাম, আমাদের সকলের সংগ্রাম, সুতরাং এ-লড়াই জিততে হবে। মনে রাখবেন আমাদের প্রত্যেকের বুকেই আছে ভিয়েতনাম—। শুনে সমবেত জনতা হর্ষধ্বনি করে উঠলো 'ভিয়েতনাম লাল সেলাম' বলে।"[৩২] এটি ভিয়েতনামকে সমর্থন জানিয়ে আয়োজিত একটি মিছিল। ছয়ের দশকের মাঝামাঝি প্রগতিবাদী বামপন্থীদের কাছে 'ভিয়েতনাম' ছিল একটি প্রতিবাদী প্রাণের সংকেতবাহী শব্দ। কিন্তু প্রিয়নাথের পাশে মিছিলে হাঁটা তার সঙ্গী মধু বিশ্বাস হঠাৎ বলে উঠে— 'হ্যাঁ, মশাই প্রিয়নাথবাবু, ভিয়েতনাম জায়গাটা কোথায়? এরকম প্রশ্নে বোঝা যায়, রাজনীতি সম্পর্কে তখনো পশ্চিমবাংলার মানুষ কতোটা অসচেতন।

দিব্যেন্দু পালিতের যখন লেখক জীবন শুরু তখন ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের আবহমণ্ডলে দেশের সর্বস্তরের মানুষ নতুন করে কমিউনিস্ট পার্টির কথা রাজনৈতিক আন্দোলনের আদর্শরূপে ভাবতে পারেননি। চীনকে সমর্থন করা এবং না করার প্রশ্নে পার্টির মধ্যেই দেখা দেয় মতবিরোধ। কমিউনিস্ট পার্টি দু'ভাগ হয়ে যায়। কিছুদিন পর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ আর তীব্র খাদ্য সংকটের ফলে মানুষের মনে কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডই আস্থা জাগাতে পারেনি। এরকম পরিস্থিতিতে যখন উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়িতে কৃষক আন্দোলন বিস্ফোরিত হয় তখন তরুণেরা আপ্লুত হয়ে জীর্ণ সমাজকে ভেঙে নতুন সমাজ গড়বার স্বপ্নে বিভোর হয়ে ওঠে। বাঙালি মধ্যবিত্তরা আবেগ আর ভয়ের টানে গড়িয়ে যান। তবু মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা তাদের স্বপ্ন আর বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে আসে। তাদের ভুল-ভ্রান্তি ছিল, কিন্তু স্বার্থবুদ্ধিবিহীন সেই ভ্রান্তি মানুষের শ্রদ্ধাও অনেকটা আকর্ষণ

করেছিল। সন্দেহের বশে গ্রেপ্তার আর জেলখানার ভিতরে অমানবিক অত্যাচার, বিচারের ব্যবস্থা না করেই এনকাউন্টার— এসব ঘটনায় একটু হলেও বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ নকশালপন্থী তরুণদের প্রতি সহমর্মী হয়েছিল।

দিব্যেন্দু পালিতের 'উড়োচিঠি' (১৯৭৮) উপন্যাসটি এরকমই আবহে লিখিত। সাতের দশকের রাজনীতি আর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সংযোগ ছিল। এই উপন্যাসেও দিব্যেন্দু পালিত কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন বা মতাদর্শের উপর দৃষ্টিপাত করেননি। আন্দোলন চলাকালীন পুলিসের গুলির আড়ালে যে সমস্ত তাজা প্রাণগুলি বেঁচে থাকে তাদেরকে নিয়ে চিন্তিত লেখক। রাজনৈতিক পরিস্থিতি আর পুলিসি ব্যবস্থার ফাঁদে পড়ে নিরাপত্তা হারানো তরুণদের লেখক এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন।

এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রজত স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্র। একদিন পুলিসের গাড়ি এসে স্কুল থেকেই তাকে তুলে নিয়ে যায়— "জামার কলার চেপে ধরেছে একটা কনস্টেবল, আর একজন টানছে হাত ধরে। বুটের খটখটানি তুলে বেটন হাতে ইন্সপেক্টর এগিয়ে যাচ্ছে সামনে, কোমরের বেল্টে খোলসপরা রিভলভার। স্কুল কম্পাউণ্ড থেকে যতোই এগোচ্ছে কালো গাড়িটার দিকে, ততোই চিৎকার করছে রজত, স্যার আমাকে বাঁচান। স্যার আমি কিছু করিনি— "[৩৩] এরকম দৃশ্যে স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক সবাই উঠে এসেছে বারান্দায়। কেউ প্রতিবাদটুকু বা আটকানোর চেষ্টা পর্যন্ত করেনি। ইতিহাসের শিক্ষিকা মৈত্রেয়ী দেবী হেডমাস্টারকে বলেন, "এ কী, মাস্টারমশাই, ছেলেটাকে তো মেরে ফেলবে! আপনি প্রতিবাদ করছেন না কেন!"[৩৪] এর উত্তরে হেডমাস্টারমশাই বলেন, "আমি প্রতিবাদ কররার কে! পুলিশের অর্ডার!...একটা নিরীহ ছেলেকে এইভাবে ধরে নিয়ে গেল! জাস্টিস কি আমার হাতে— !"[৩৫] উপন্যাসের প্রথমে এই অংশটুকুর বর্ণনায় আমরা বুঝতে পারি দেশের বিচার ব্যবস্থা প্রহসনে পরিণত। জেলে গিয়ে রজতকে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। বিনা দোষে রজতকে জেল খাটতে হয়েছে। জেলে বসে বসে ভাবে, "সে খুন-টুন করেনি কোনো, জানেই না কেন ধরে আনা হল তাকে। তবে যদি ছাড়া পায়, খুন তাকেও করতে হবে।"[৩৬] আমরা জানি, এইভাবেই সাত-আটের দশকে রাজনীতির আশ্রয়ে অনেক দুষ্কৃতী তৈরী হয়েছিল।

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর রজত আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। যে পিতৃবন্ধুর বাড়িতে থাকতো তারা থাকতে দেয়নি। সরকারী চাকরি করা নিজের দাদাও রাজনীতির চাপে তাকে থাকার জায়গা দেয়নি। এমনকি মাসে মাসে যে টাকা দিত সেটাও বন্ধ করে দিয়েছিল। রজত নিজের লড়াই নিজে চালিয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। কিন্তু সেখানেও আকস্মিকভাবে আসন্ন ছাত্র-নির্বাচনে ভোট চাইতে আসা সমর্থক দলের সাথে তার বাদ-বিবাদ শুরু হয়। ক্লাসেই মারপিট হয়। সে মার খায় এবং নিজেও মার দেয়। ভোট চাইতে আসা সমর্থক দলের প্রতি রজতের আচরণে একটু বাড়াবাড়িই ছিল। কিন্তু প্রশাসনের ক্ষমতার রাজনীতির প্রতি তার এই ঘৃণা পূর্বের চেপে রাখা ঘৃণারই বহিঃপ্রকাশ নয় কি?

'চরিত্র' (১৯৭৬) উপন্যাসে ব্রতীন আর আহামরির বারো বছরের দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন ধরা পড়েছে। এতোদিনের দাম্পত্য জীবনে তাদের সন্তান হয়নি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই দুজনের মধ্যেই দেখা দিয়েছে মনোমালিন্য। মধ্যবিত্তশ্রেণির হওয়ায় দুজনের কেউই ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারেনি। ব্রতীন কলেজের অধ্যাপক। তার সহকর্মী বন্ধু নৃসিংহকে ঘিরে তৈরী হয়েছে ব্রতীন-আহামরি-নৃসিংহ ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনি। নৃসিংহ বিয়ে করেনি। ব্রতীনের সঙ্গে দীর্ঘদিনের মেলামেশায় বন্ধুত্ব আরো ঘন হয়। আহামরির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা বাড়ে নৃসিংহর। ব্রতীন ধীরে ধীরে বুঝতে পারে তার স্ত্রীর প্রতি নৃসিংহের দুর্বলতা। ফলে ব্রতীনের মনে সন্দেহ ও ঘৃণা এসেছে। নিঃসন্তান আহামরিও নৃসিংহের সঙ্গে সম্পর্কে এতোটা খারাপ চোখে দেখত না। শুধু মাঝে মাঝে তার স্বামীর প্রতি প্রেমের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে সিনেমা হলে ব্রতীনের প্রথম চুম্বনের কথা। বারো বছর পর আহামরি বুঝতে পারে তার স্বামীর সন্তান দেওয়ার ক্ষমতা নেই। নৃসিংহই একমাত্র সম্বল তার। তাই ব্রতীনের নিষেধ সত্ত্বেও আহামরি নৃসিংহের সঙ্গে মিশেছে, নৃসিংহের ফ্ল্যাটে গেছে, শরীরী খেলায় মেতেছে। উপন্যাসের শেষে আহামরি সন্তান সম্ভবা হয়েছে। মনের ভিতর তার খুশির আলোড়ন। স্বামীর সন্তান নয় জেনেও সন্তানকে অস্বীকার করেনি। বরং ডাক্তারের চেম্বার থেকে বের হয়ে মুখ নিচু করে হেসেছে। গাড়ির সিটে হেলান দিয়ে শান্তির দীর্ঘশ্বাস নিয়েছে।

কুড়ি বছরের দাম্পত্য সম্পর্ক ভেঙে যায় তৃতীয় পুরুষের প্রবেশের ফলে। তখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আর মিল থাকে না। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কোনো দায়িত্ব, কর্তব্য দেখা যায় না। শুধু সন্দেহ বড়ো হয়ে ওঠে। নিজের সন্তানের মুখ দেখে মনে হয় অন্য কারোর সন্তান।

জ্যোতি আর নীপার দাম্পত্য সম্পর্ককে কেন্দ্র করে এরকমই কাহিনি গড়ে উঠেছে 'অহঙ্কার' (১৯৮২) উপন্যাসে। জ্যোতি আর নীপার বাড়িতে প্রায় কুড়ি বছর ধরে বাস করে ভারাটে বিমান। দীর্ঘদিন পাশাপাশি থাকার ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু নীপা আর বিমানের পারস্পরিক মেলামেশা জ্যোতি সহ্য করতে পারেনি। সন্দেহ করেছে নীপাকে আর তাদের সন্তান সুদেষ্ণাকে। প্রচণ্ড অভিমান আর ক্রোধে স্ত্রীকে একদিন আঘাত করে সে। নীপা স্বামীর উপর বিশ্বাস হারায়। মেয়েকে নিয়ে বিমানের সঙ্গে চলে যেতে চায়। জ্যোতি পৌরুষত্বে এক অর্থে দুর্বল ছিল। তাই নীপাকে বিমানের উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু বিমান তাদেরকে আশ্রয় দিতে পারেনি। পৌরুষের চেয়ে স্বামিত্বের জোর বেশি থাকায় বিমান নীপা আর সুদেষ্ণাকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারেনি। ফলে দুই পুরুষের মাঝে নীপা মানসিক যন্ত্রণায় ভোগে। এই উপন্যাসে মধ্যবিত্ত নরনারীর সীমাবদ্ধতাকে লেখক দেখিয়েছেন। জ্যোতি সন্দেহের বশে ক্রোধে ঘৃণায় নীপাকে মারলে নীপা স্বামীর দেওয়া সিঁদুরকে কোনোদিন মুছে ফেলতে পারেনি। এক ধরনের নীতিবোধ থেকে বিমানও নীপাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারেনি। উপন্যাসে শেষে জ্যোতি মারা গেলে নীপা আর সুদেষ্ণার প্রতি বিমান এক প্রকারের দায়িত্ববোধ নিয়ে এসেছিল।

গ. তৃতীয় পর্ব ['সহযোদ্ধা' (১৯৮৪) থেকে 'গৃহবন্দী' (১৯৯১)] :

এই পর্বের উপন্যাসগুলি হলো— 'সহযোদ্ধা' (১৯৮৪), 'ঘরবাড়ি' (১৯৮৪), 'আড়াল' (১৯৮৬), 'সোনালী জীবন' (১৯৮৬), 'ঢেউ' (১৯৮৭) 'স্বপ্নের ভিতর' (১৯৮৮), 'অন্তর্ধান' (১৯৮৯), 'অবৈধ' (১৯৮৯), 'সিনেমায় যেমন হয়' (১৯৯০), 'অনুসরণ' (১৯৯০) এবং 'গৃহবন্দী' (১৯৯১)।

'সহযোদ্ধা' উপন্যাসটি নয়ের দশকের গোড়ায় রচিত। কিন্তু এর পটভূমিতে রয়েছে ছয়-সাত দশকের নকশাল আন্দোলন। চারিদিকে তখন বারুদের গন্ধ। ষোলো থেকে ছত্রিশ বছর হলেই পুলিস এনকাউন্টার করে। তবুও যুবশক্তি শোষণশক্তির হাত থেকে মুক্তির স্বপ্নে বিভোর। এই টালমাটাল রাজনৈতিক হাওয়ার ঝড় এই উপন্যাসের নায়ক আদিত্য রায়ের গায়েও লেগেছিল। তবে রাজনীতির কোনো মতাদর্শ এখানেও নেই। উপন্যাসের পরিণতিতে স্থায়িত্ব লাভ করেছে আদিত্যর বিবেক।

একদিন ভোরে মর্নিং-ওয়াকে গিয়ে সে পুলিসের গুলিতে একটি রোগা ও লম্বা লোককে নিহত হতে দেখে। সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে আসে বাড়িতে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তার আত্মবিবেক জেগে ওঠে এবং সে আত্মদ্বন্দ্বে ভুগে। সাক্ষ্য দিবে কী না? পুলিসের কাছে জানাবে কী না? জানিয়েই বা লাভ কী? আর যে খুন হলো তার সাথে কোনো সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও কেন সে সাক্ষ্য দিবে? কিংবা যে খুন হলো সে কোনো দিন জানতেই পারলো না তার খুনের কেউ সাক্ষী আছে? খুনিদের কোনো বিচার হবে কী না? তার মনে প্রশ্ন জাগে, এই যে আমি এতোদিন ধরে লেখার মধ্যদিয়ে যা বলতে চেয়েছি, এই যে প্রতিবাদের এতো বিবৃতি দিয়েছি; এর অর্থ কি? প্রচণ্ড যন্ত্রণাবোধ মনে নিয়ে দুদিন কেটে যায়। অবশেষে সে স্থির করে থানায় ডায়েরি করবে। পার্ক স্ট্রিট থানায় ফোন করে ঘটনাটি জানালে থানা থেকে তাকে রূঢ়ভাবে ধমক দেওয়া হয়। আদিত্য শেষ পর্যন্ত খুনের প্রমাণ হিসাবে খবরের কাগজে স্বনামে চিঠি লেখে। লেখে সে খুন হতে দেখেছে। সমস্ত ঘটনাটির সঙ্গে মিলে যায় একটা খবর, নকশালদের একজন বড়ো নেতাকে পুলিস গ্রেপ্তার করেছে এবং চারু মজুমদার স্টেটমেন্ট দিয়েছে, সেদিন ভোর রাতেই তাকে পুলিস মেরে ফেলেছে। তাই নকশালরাও আদিত্যকে রাতে ফোন করে হুমকি দেয়, "আপনাকে পরিষ্কার করে বলতে হবে যাকে মার্ডার করা হয়েছে সে কমরেড শৈবাল মজুমদার। তিনদিন সময় দেওয়া হল। আমাদের অর্ডার না শুনলে আপনাকে শ্রেণীশত্রু বলে ধরে নেওয়া হবে— "[৩৭] আদিত্যর মনে বিস্ফোরণ ওঠে। তার কানে নিজেরই কণ্ঠস্বর বাজতে থাকে সে 'হিপোক্রিট' বা 'কাওয়ার্ড' নয়।

আদিত্যর স্রষ্টা দিব্যেন্দু পালিতের জীবনেও এরকম ঘটনা ঘটেছিল। ৮ জুন ১৯৯২ সালে বালিগঞ্জ উপনির্বাচনে চোখের সামনে অন্যায় ঘটতে দেখে চুপ করে থাকতে পারেননি দিব্যেন্দু পালিত। তিনি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন। এরপর তাঁকে চিঠিতে, ফোনে, এমনকি প্রত্যক্ষেও অনেকে ভয় দেখিয়েছিলেন। এছাড়াও দু'একটি বেনামী চিঠিতে এমন কথাও লেখা হয়েছিল যে, তিনি যে আঙুল দিয়ে ঐ প্রতিবাদ লিখেছেন, সেই আঙুল কেটে ফেলা হবে। যেন আর কোনো দিনও এরকম দুঃসাহস দেখাতে না পারেন। কার্যক্ষেত্রে সেরকম কিছুই ঘটেনি। কিন্তু মনোভাবটা অস্পষ্ট ছিল না।[৩৮]

১৯৯১ সালে প্রকাশ পায় দিব্যেন্দু পালিতের 'গৃহবন্দী' উপন্যাস। এখানে নকশাল আন্দোলনের অন্তিম পর্ব স্থান পেয়েছে বলা যেতে পারে। বাস্তবে একসময় ছাত্র রাজনীতি করা কিছু তরুণ তরুণী রাজনীতি ছেড়ে কেরিয়ারিস্ট হয়ে পড়েছিল। এই উপন্যাসে এরকমই কয়েকজন তরুণ তরুণীকে আমরা পাই। তীর্থঙ্কর, রণজয়, সুশান্ত, সুতপা, পারমিতা— এরা একসময় কলেজে পড়তো এবং রাজনীতি করতো। শৈশবে এরা কমিউনিস্ট পার্টির দীক্ষা নিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে নিজের কেরিয়ার তৈরী করতে রাজনীতির সাম্প্রতিকতা থেকে সরে গিয়েছে। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রণজয়কে কমিউনিস্ট পার্টি করা তীর্থঙ্কর লিখেছে—

> "শৈশবে রাজনীতিতে দীক্ষা লইয়াছিলাম। যত দূর পারিয়াছি পার্টির কাছে আত্মনিয়োগ করিয়া বুঝিয়াছিলাম আমার বিশ্বাসে ভুল নাই— সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক প্রয়াস অর্থনৈতিক শ্রেণিবিভেদ দূর করিয়া মানুষে মানুষে সাম্য আনিতে পারে, সমাজের পক্ষে অশুভ ও হানিকর শক্তিগুলিকে নির্মূল করিয়া বৈষম্য দূর করিয়া সকলের কাছেই বাঁচার সার্থকতা প্রমাণ করিতে পারে। সংঘবদ্ধ আন্দোলন ও প্রতিবাদ সংগঠনের মধ্য দিয়া পুরুষ নারী নির্বিশেষে সকলের জন্য সাম্য অর্জন করিতে পারে। দেশও গড়িতে পারে।"[৩৯]

অনিন্দ্য এবং তীর্থঙ্কর নকশাল আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য ছিল। বন্ধু সুশান্তর বিশ্বাসঘাতকতায় অনিন্দ্য পুলিসের গুলিতে প্রাণ হারায়। অপরদিকে রাজনীতিই ছিল তীর্থঙ্করের শেষ আশ্রয়। আদর্শহীন রাজনীতির উপর সে নির্ভর করতে পারেনি। সে চিঠিতে রণজয়কে জানিয়েছে— "রাজনীতি হইতে আদর্শবোধ ও সততা চলিয়া গিয়াছে; শুধু রাজনীতির জন্য রাজনীতি করিলে যাহা হয় তাহাই হইতেছে। যে যার নিজের পার্টির জন্য এবং নিজের জন্য গুছাইতে ব্যস্ত। ইহাতে যদি মিথ্যাকে সত্য বলিয়া চালাইতে হয়— দুর্নীতি ও দুষ্কর্ম প্রশ্রয় দিতে হয়, তাহাতেও পিছপা নাই। মানব কল্যাণের লক্ষ্যে স্লোগান আছে, নিরপেক্ষতা নাই, সততাও নাই। ইহার পরিবর্তে ক্ষমতার জোর আসিয়াছে।"[৪০] উপন্যাসের শেষে রাজনীতির কাছে হেরে যাওয়া তীর্থঙ্করের শেষ আশ্রয় হয়ে ওঠে আত্মহত্যা। অপরদিকে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রণজয় ও তার স্ত্রী সংসার ধর্ম পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এরা আর পার্টি করেনি। সুতপা একটি অনাথ শিশুকে পালন করে মাতৃত্বের বোধে উদ্দীপ্ত

হয়েছে। আসলে এরা বুঝতে পেরেছিল রাজনীতির মূল্যে কিছু কিছু গোলমাল দেখা দিলেও কোনো কোনো ব্যক্তির নৈতিক মূল্য অটুট আছে এবং থাকবে।

'ঘরবাড়ি' (১৯৮৪) উপন্যাসে ফ্ল্যাটবাড়ি কেনাকে কেন্দ্র করে হিমাদ্রি ও জয়ার পাঁচ বছরের দাম্পত্য সম্পর্কে চিড় ধরে। এক সময় উভয়ের মধ্যে দাম্পত্য প্রেম ছিল মধুর। পরস্পরের মধ্যে নির্ভরতাও ছিল যথেষ্ট। ছোটো একটা ভাড়াবাড়িতে দীর্ঘদিন থাকতে থাকতে তাদের মনে হয়েছিল পরাধীন ও পরাশ্রিত তারা। তাই উভয়ের মনে জাগে স্বাধীন ও সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য একটা নিজস্ব আশ্রয়। সেই থেকেই তারা একটা ফ্ল্যাট কেনার ভাবনাচিন্তা করে। কিন্তু চরম আর্থিক সংকট দেখা দেয়। স্বপ্ন থেকে আশাভঙ্গের কাহিনিই 'ঘরবাড়ি' উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।

আবাহন কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটির অফিসে পঁচাশি হাজার টাকা অগ্রিম জমা দেবার পরেও শেষ কিস্তির সাড়ে বারো হাজার টাকা দিতে না পারায় জয়া ও হিমাদ্রি ফ্ল্যাটের 'পজিশন' পায়নি। অবশিষ্ট টাকা কীভাবে জোগাড় করবে তা ভেবে দুজনেই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। বিশেষকরে চৌত্রিশ বছরের হিমাদ্রিকে অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগ ক্রমাগত অসহায় করে তুলেছে। অবশেষে শেষ কিস্তির টাকা কিনারা করতে রাতের অন্ধকারে হিমাদ্রির চোখে পড়ে জয়ার বিছে হার ও দুটো সোনার বালা।

অপরদিকে অবনীবাবু বিজ্ঞাপন এজেন্সিতে জয়াকে মডেল করার জন্য হিমাদ্রিকে প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু নিজের স্ত্রীকে মডেল হিসাবে দেখতে মন চায়নি হিমাদ্রির। তার মনে জয়ার প্রতি অধিকার হারানোর ভয় জেগে উঠে। চরম আর্থিক সঙ্কটে অবনীর প্রস্তাব না মেনে অন্য উপায়ও খুঁজে পায়নি। ফলে স্ত্রীর মডেলিং করাকে কেন্দ্র করে হিমাদ্রির মনে প্রবল দ্বন্দ্বের জন্ম হয়। স্ত্রীর প্রতি সে রুক্ষ হয়ে ওঠে।

জয়ার মনে হয়েছিল অভাবী মানুষের কাছে টাকাই সবকিছুর ঊর্ধ্বে। কোনোরকমে টাকা জোগাড় করে দেনা শোধ করলে আবার আগের মতো সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। এরকম অভিজ্ঞতা তার আগেও হয়েছিল। বাপের বাড়িতে সে দেখেছিল অভাবের তাড়নায় কিভাবে দিশাহীন হয়ে পড়েছিল তার বাবা। সেরকম দশায় হিমাদ্রি যেন না পড়ে তার জন্যই সে সাধুখাঁর স্টুডিয়োয় মডেলিং করতে রাজি হয়। মাত্র দু'হাজার টাকার বিনিময়ে জয়ার

পোশাক পরিচ্ছদে আসে অপরিচয়ের আদল। যার মধ্যে হিমাদ্রি কোনো অধিকার দেখাতে পারেনি। ঘরের এক কোণে বসে জয়ার থেকে নিজের দূরত্ব অনুভব করে সে। অপরদিকে হিমাদ্রির সামাজিক অনুশাসনকে উপেক্ষা করা জয়ার পক্ষে সহজ হয়ে ওঠেনি। তাই তাকে কলঙ্কের হাত থেকে মুক্তি পেতে আত্মবলিদানের আশ্রয় নিতে হয়েছে।

'আড়াল' (১৯৮৬) উপন্যাসে রুচি আর সোমেনের দীর্ঘ চব্বিশ বছরের দাম্পত্যসম্পর্কের মধ্যে দেখা দেয় ক্লান্তি বা অবসাদ। স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস তখন আর থাকে না। পরস্পরের মধ্যে দূরত্বটাই তখন মুখ্য হয়ে ওঠে। আভা আর দীপঙ্করের দাম্পত্যজীবনেও সুখ আসেনি। তাদের দাম্পত্যজীবনে ক্লান্তি বেড়েছে সন্তান না হওয়ার নিঃসঙ্গতায়। সংসার জীবনের একটানা অভ্যাসে বদ্ধ রুচি নাটকে অভিনয় করার সূত্রে সোমেনের বন্ধু দীপঙ্করের কাছাকাছি আসে। রুচি আর দীপঙ্করের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বাড়তে থাকে। এক সান্ধ্য আড্ডায় দীপঙ্কর মদ্যপ অবস্থায় রুচির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে গিয়ে ধরা পরে যায় সোমেনের কাছে। সেই থেকে সোমেনের মনে স্ত্রী সম্পর্কে জেগেছে সন্দেহ। যা ক্রমশ তার ও রুচির মধ্যে দূরত্ব তৈরী করে।

সন্তান-সন্ততি এবং স্বামী থাকা সত্ত্বেও বিয়াল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছে রুচির মনে দেখা দেয় তার জীবনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা। চব্বিশ বছর ধরে সোমেনের সঙ্গে ঘর-সংসার করার পরেও দীপঙ্করের স্পর্শ তার কাছে হয়ে ওঠে এক ধরনের পরম তৃপ্তি। চব্বিশ বছর ধরে যে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে আড়ালে রেখেছিল সে তা এখন দীপঙ্করের মধ্যদিয়ে পূরণ করতে চেয়েছে। দীপঙ্করও আভাকে ডিভোর্স দিতে চেয়েছে। কিন্তু তাদের সেই অবৈধ ভালোবাসা স্বপ্নই থেকে গেছে। জরায়ু ক্যানসারে রুচির মৃত্যু হয়।

বিবাহবিচ্ছিন্ন দুই নিঃসঙ্গ নরনারীর আকস্মিক মেলামেশায় গড়ে উঠেছে 'মাইন নদীর জল' (১৯৮৮) উপন্যাসটি। এই উপন্যাসটির পটভূমি কলকাতা নয়, জার্মানির ফ্রাঙ্কফুট শহর। লেখক এই সময় পর্বে বেশ কয়েকবার বিদেশ ভ্রমণ করেছেন। ১৯৭৮ সালে আমেরিকা এবং এরপর জার্মানি, ইতালি প্রভৃতিসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশ যান সেমিনারে কিংবা বক্তৃতা দেবার জন্য। সেই অভিজ্ঞতাকে তিনি সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। উপন্যাসের মূল পুরুষচরিত্রকে অবশ্য কলকাতার মধ্যবিত্ত পুরুষকেই রেখেছেন। পেশায় অধ্যাপক অমিতাভ সেন স্ত্রীর কাছে অপমানিত হয়ে প্রথমে লন্ডন এবং পরে জার্মানি যান সেমিনারে

বক্তৃতা দেবার জন্য। সেখানে তাকে দেখাশোনার জন্য গাইড করে ইউনিভার্সিটির গবেষিকা রোজমেরি কাত্‌জ্‌ নামের একটি মেয়ে। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে অমিতাভের নিঃসঙ্গ মনের চিত্র এবং সেই সঙ্গে রোজমেরির সঙ্গে ক্ষণিকের মেলামেশায় অমিতাভের মানসিক টানাপোড়েনকে লেখক তুলে ধরেছেন।

অমিতাভ ভালোবেসে বিয়ে করেছিল রুবিকে। সাত বছরের দাম্পত্য সম্পর্কে তাদের এক ছেলে হয় কুশ। তাদের সম্পর্কে হঠাৎই তৃতীয় পুরুষের আগমন ঘটে রুবির বন্ধু অতীনের। অতীনের সঙ্গে রুবির মেলামেশাকে মেনে নিতে পারেনি অমিতাভ। অন্যদিকে অমিতাভের সন্দেহকেও মেনে নিতে পারেনি রুবি। রুবি অমিতাভকে একপ্রকার অপমান করে বলে, 'আদিবাসী নিয়ে পড়াশুনো করতে করতে তুমি নিজেও আদিবাসী হয়ে যাবে, এটা বুঝলে এগোতাম না!' এরকম অপমান জীবনে আর কখনো বোধ করতে পারেনি অমিতাভ, সহ্য করতে পারেনি এই অপমানবোধ। তীব্র এই অপমানে ডিভোর্সের দিকে এগোয় তাদের সম্পর্ক। কিন্তু অমিতাভের মনে প্রশ্ন ওঠে—

> "কোনো মানুষ কি সত্যিই একা থাকতে পারে— কি পুরুষ, কি নারী, প্রত্যেকেরই নির্ভরতার প্রয়োজন থাকে। কিন্তু কিছু চাওয়ারও থাকে, যার মধ্যে নিজের পূর্ণতাকে খুঁজে পাওয়া যায়— "[৪১]

অনুভব করে, "সম্পর্কের আগুনে একবার হাত পোড়ালে ঘা হয়তো শুকোয় কিন্তু দাগটা থেকেই যায়। যদি রুবির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় তার, তাহলেও কি রুবি সম্পূর্ণ মুছে যাবে মন থেকে?"[৪২] একপ্রকারের অনিশ্চিতবোধ থেকে একা হতে থাকে অমিতাভ। নিঃসঙ্গ জীবনে সঙ্গ খোঁজে যে কোনো একজনের। জার্মানিতে এসে সেই নিঃসঙ্গ জীবনের আনন্দ ফিরে পায় রোজমেরির কাছে। সাঁইত্রিশ বছর বয়সে এসে আকস্মিকতায় জড়িয়ে পড়ে রোজমেরির ভালোবাসায়। সেই ভালোবাসা ক্রমে শারীরিক সম্পর্কে এগোতে থাকে। বিবাহবিচ্ছিন্না রোজমেরিও তার পঁচিশ বছরের নিঃসঙ্গ জীবনে অমিতাভকে পেয়ে সবকিছু উদার করে দেয়। তখন তাদের সম্পর্কটা গাইড আর ভিজিটরের নয়, সেই চিরন্তন নারী-পুরুষের হয়ে ওঠে।

নষ্ট দাম্পত্য সম্পর্কের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় রচিত 'সিনেমায় যেমন হয়' (১৯৯০) উপন্যাসটি। সিনেমার মতোই মধ্যবিত্ত সংসারে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে যে সামঞ্জস্যের আস্তরণ দেখা যায়, এই উপন্যাসে গার্গী ও দীপঙ্করের মধ্যে তার প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। এদের দাম্পত্য সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছে প্রবল টানাপোড়েন। সেই সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার মধ্যদিয়ে সমাপ্ত হয়েছে উপন্যাসটি।

প্রথম থেকেই গার্গীকে দীপঙ্করের পরিবারের লোকজন কেউই পছন্দ করতো না। বাবা-মার অমতে দীপঙ্কর বিয়ে করেছিল অপেক্ষাকৃত অসবর্ণ জাতির মেয়ে গার্গীকে। তাছাড়া স্বাবলম্বী হওয়ার দিকে গার্গীর বাড়তি ঝোঁক ছিল। এখান থেকেই সমস্যার সূত্রপাত। বিয়ের কয়েকদিন পরই স্ত্রীকে নিয়ে দীপঙ্কর চলে আসে ফ্ল্যাটে। দীপঙ্করের ইচ্ছে চাকরি ছেড়ে গার্গী গৃহবধূ হয়েই থাকুক। এই নিয়ে দুজনের মধ্যে প্রায়ই মান-অভিমান এবং ঝগড়া লেগেই থাকতো। ছেলে জন্মানোয় সেই অশান্তি আরো বাড়তে থাকে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকরি করার ফলে একমাত্র সন্তান দীপ্রকে দেখার কেউ ছিল না। তাই দীপঙ্কর গার্গীর অসহায়তার সুযোগ বুঝে চাকরি ছাড়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু দাম্পত্যজীবনের আড়ালে অর্থনির্ভরতার জন্য গার্গীর চাকরি ছাড়ার জেদ আরো বাড়তে থাকে। কারণ বিয়ের পরও সে বৃদ্ধ বাবাকে সাহায্য করার জন্য প্রতি মাসে পাঁচশো টাকা করে পাঠাতো। সেই টাকা দীপঙ্কর দিতে চাইলে গার্গী রাজী হয়নি। কারণ দীপঙ্কর শ্বশুর বাড়ি যেত না।

দীপঙ্করের জীবনযাপন ছিল একরোখা প্রকৃতির। বড়োলোক বাবার একমাত্র পুত্র হিসাবে সে অশৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। স্ত্রী-সন্তান কাউকেই সময় দিতে পারেনি। উপরন্তু তাদের উপর জোর খাটিয়েছে। সামাজিক অনুশাসনে বদ্ধ করে রাখতে চেয়েছিল গার্গীকে। গার্গীকে সন্দেহ করেছে। গার্গীর বৌদির দাদা ইন্দ্রনাথের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে মিথ্যে অপবাদ দিয়েছে। সবশেষে দীপঙ্কর গার্গীকে ডিভোর্স দিয়ে শান্তা নামের আর একটি মেয়েকে বিয়ে করে।

গার্গী আর দীপঙ্করের দাম্পত্য সম্পর্ক মাত্র সাত বছর টিকে ছিল। লেখক এখানে দেখিয়েছেন, দাম্পত্যজীবনের কতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাও নানামুখী ফাটলের সৃষ্টি করে। সম্পর্ক একটা সংস্কার হয়ে দাঁড়ায় মাত্র। এর অন্তরালে যে যার নিজের মতো আচরণ করে চলে।

বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক থেকে দিব্যেন্দু পালিতের একটি ব্যতিক্রমী উপন্যাস ‘সোনালী জীবন’। উপন্যাসটি ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়। লেখক এটি উৎসর্গ করেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে। একটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পরিবারের কাহিনি উপন্যাসটির মূল বিষয়বস্তু।

ভারতবর্ষ স্বাধীনতার আগে ব্রিটিশ সৈনিক আর্থার পাইবাস বার্মামুলুকে পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে আর দেশে ফিরতে পারেনি। এখন তার বয়স আশি। স্ত্রী ডরোথি, ছেলে রবিন, পুত্রবধূ সারা, তাদের ছেলে স্যামুয়েল, আর্থারের তিন মেয়ে রোজালিন, অড্রি এবং লরা— এদের নিয়ে কলকাতার রিপন স্ট্রিটে সোনালী জীবন শুরু করেছিল। উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র সারা। সে বাঙালি মেয়ে। স্কুলের পাঠ চুকিয়ে কলেজে ঢোকবার আগেই আর্থার পাইবাসের ছেলে রবিনের সঙ্গে বিয়ে হয়। তখন আর্থার বলেছিল, ‘তুমি এক সোনালী জীবনে এসে প্রবেশ করছ, তোমার সংস্পর্শে যেন সকলের ভাল হয়’।[৪৩] সারা গোটাজীবন ধরে সেই চেষ্টাই করেছিল। নিজের দেহসর্বস্ব দিয়েও বাঁচাতে চেয়েছিল পরিবারটিকে। কিন্তু উপন্যাসের শেষে তাকে আত্মহত্যার পথ খুঁজে নিতে হয়। আর্থার পাইবাসের স্বপ্নে দেখা সোনালী জীবন নষ্ট হয়ে যায়।

উপন্যাসে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে বিনা লাইসেন্সে গাড়ি চালানো এবং অ্যাক্সিডেন্ট করার অপরাধে স্যামুয়েলের পুলিসের হাতে ধরা পড়া এবং ছেলেকে ছাড়াতে গিয়ে পুলিসের সঙ্গে বচসায় রবিনেরও জেল হওয়াতে। পাইবাস পরিবারের সঙ্কটে রিপন স্ট্রিটের আর পাঁচটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পরিবার সহানুভূতি দেখালেও সাহায্য করার জন্য কেউ এগিয়ে আসেনি। স্বামী ও ছেলেকে ছাড়াতে সারাকেই থানায় একা যেতে হয়। সারার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে থানার বড়বাবু তাকে নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে বলাৎকার করে। শুধু তাই নয়, স্বামী আর ছেলেকে জেল থেকে ছাড়াতে সারাকে বড়বাবুর বন্ধু সিং-এর কাছেও ধর্ষিত হতে হয়। সারা পুরোপুরি উপভোগ্যের পণ্য হয়ে যায়। মধ্যবিত্ত নারী সারা কলঙ্কের ভয়ে কাউকে বলতেও পারেনি। আড়ালে থেকে গেছে বিষয়টা। এই পরিস্থিতিতে সারা আত্মহত্যার কথা চিন্তা করে। কিন্তু পারে না। বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ি, ক্ষ্যাপাটে স্বামী আর বাউণ্ডুলে ছেলেকে ফেলে একা মুক্তির কথা ভাবতে পারেনি। তাই তো সংসারকে ফেরাতে বড়বাবুর বন্ধু সিং-এর দেওয়া চাকরি নিতে হয়েছিল সারাকে। চাকরি দেওয়ার পিছনে বড়বাবুর মতলব বুঝতে পারে সারা। একটুখানি বাঁচার মতো বেঁচে থাকার জন্য স্বামী আর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে

অস্ট্রেলিয়া পাড়ি দিয়েছিল। কিন্তু সেখানে তার মানসিকতার অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। অপমান, ক্ষোভ আর যন্ত্রণা নিয়ে সে আত্মহত্যা করে। রোজালিনকে চিঠি লিখে শেষ হয় তার বক্তব্য—

> "অন্যকে নিয়ে বাঁচার আগে মানুষকে আগে বাঁচতে হয় নিজেকে নিয়ে— নিজের শুদ্ধতাই অন্যকে স্পর্শ করে, পরিশুদ্ধ করে। আমার সব জবাবদিহিও তো আমার নিজেরই কাছে! সেটা করতে গিয়ে দেখছি, যে-সারাকে আমি চিনতাম সে আর কোথাও নেই।"[৪৪]

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে পুঁজিবাদী শক্তিগুলির আত্মপ্রকাশ চোখে পড়ার মতো ছিল। ব্যবসা, পুঁজি, লেনদেন, মুনাফা অর্জনের নেশায় পরস্পরের মধ্যে ভয়ংকর রেষারেষি চলেছিল। জনগণের বিলাসিতা ও ভোগসুখকে কাজে লাগিয়ে বাজার ধরার জন্য মেতে উঠেছিল, তাতে প্রতিষ্ঠানের আগে ব্যক্তিমানুষ কোনোদিনই গুরুত্ব পায়নি। নিজের যাবতীয় দক্ষতা ও তৎপরতা সত্ত্বেও ব্যক্তিমানুষ একা হয়ে পড়েছে। পুঁজিবাদ নারীর দৈহিক সৌন্দর্যকে নিয়েও বাণিজ্যে নেমেছে। রাজনৈতিক নেতারাও অবতীর্ণ হয়েছিল শোষকের ভূমিকায়। তারাও মুনাফার নেশা আর ক্ষমতার স্বপ্নে মেতে উঠেছিল। এসব নিয়েই দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাস 'ঢেউ' (১৯৮৭)।

'ঢেউ' উপন্যাসটি বিজ্ঞাপন ও বিপণন বিষয়ে দিব্যেন্দু পালিতের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই উপন্যাসের মূল চরিত্র তিনটি— অপরেশ গুপ্ত, অপূর্ব বসু এবং সীতা চৌধুরী। অপরেশ গুপ্ত অ্যাকশন গ্রুপ অ্যাডভার্টাইজিং অ্যাণ্ড মার্কেটিং অ্যাসোসিয়েটস কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ঔপনিবেশিক বেনিয়াবুদ্ধি তার মাথায়। তার কাছে আগে ব্যবসা, তারপর ব্যক্তির স্থান। তার মতে—

> "পাবলিক মানেই মুখ নেই, চোখ নেই, কান নেই, পেট নেই, খিদে নেই। সুতরাং পাবলিকের টাকা নিয়ে তুমি যা খুশি করতে পারো— ।"[৪৫]

অপরেশের কোম্পানীর পুরনো ও দক্ষকর্মী অপূর্ব বসু এবং নতুন ও অনভিজ্ঞ কর্মী সীতা চৌধুরী। কোম্পানিতে সীতা চৌধুরীর প্রাধান্যের জোরে তীব্র অভিমান নিয়ে অপূর্ব বসু অপরেশের কাছে রেজিগনেশন লেটার জমা দিয়েছে। তাতে ব্যবসায়িক সম্পর্কের

টানাপোড়েনে তিনজনের মধ্যে দূরত্ব বেড়েছে। অপরেশের চোখে মুখে শুধু মুনাফার স্বপ্ন। গিলবার্ট মরিসন হিকস্-এর চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজেই একটা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি খোলে— অ্যাকশন গ্রুপ অ্যাডভার্টাইজিং অ্যাণ্ড মার্কেটিং অ্যাসোসিয়েশন। তার ব্যবসা পাঁচ বছরে কুড়ি লাখ থেকে দেড় কোটিতে পৌঁছায়। সেই সময় এই সাফল্য ছোটোখাটো একটা আলোড়ন বাজারে ফেলেছিল। অপরেশের সাফল্যের উপর আস্থা রেখেই হাইগ্রেনের মার্কেটিং ডিরেক্টর শিবাজী রাও গিলবার্ট মরিসন থেকে একটা বড়ো এবং পুরনো অ্যাকাউন্ট তুলে দিয়েছে অ্যাকশন গ্রুপকে। অপরদিকে বিউটি প্রোডাক্টস লিমিটেডের কুড়ি-পঁচিশ লাখ টাকার অ্যাকাউন্ট পেতেও মরিয়া হয়ে যায় অপরেশ। বিউটি প্রোডাক্টসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর লাডলীমোহন সরকার তুখোড় বেনিয়াবুদ্ধিসম্পন্ন। কিন্তু মদ ও মেয়ে পেলে সব কিছু ভুলে যায়। অপরেশ বিউটি প্রোডাক্টের অ্যাকাউন্ট পেতে সীতাকে ব্যবহার করেছে। সীতার ছিল অফুরন্ত আকর্ষণী শক্তি ও যৌবনের মাদকতা। বিজ্ঞাপন এবং ব্যবসার জগতে যার প্রয়োজন অপরিসীম। এই সীতা সম্পর্কে অপূর্বর বক্তব্য—

> "মানুষও দ্রব্য কিংবা প্রোডাক্ট, মানুষেরও আছে উপযোগিতা এবং টিকে থাকার সময়সীমা। সুতরাং, ওকে পাবার জন্য কেউ দাম দেবে, ওকে স্পর্শ করার, চুম্বন করার, ওর মাংসের স্বাদে ও সৌন্দর্যে সঞ্জীবিত হবার জন্যেই ভাগ্যবান হবে সে।"[৪৬]

আসলে নারীর শরীর নিয়ে পুঁজিবাদ বাণিজ্যে নেমেছে। বিক্রম দাসের স্টুডিওয় ছবি তোলার সময় অ্যাসিস্ট্যান্ট মনোজ জানিয়েছে, 'শুধু ব্রা দেখা গেলে চলবে না, লাস্ট লাইনেরও এক্সপোজার চাই'। এর জন্য নিজেকে মেলে ধরতে সীতা নিজের শরীরে ক্রিস্টিয়ান দিওরের চড়া গন্ধ ফেলে। কোমরের উন্মুক্ত মাংস জুড়ে তার সোনালি আভা। আঁচল নামানো, লোট-কাট স্লিভলেস ব্লাউজ, সুগঠিত বুক, মুখে মিলিয়ন ডলারের হাসি। সীতা হাসলে তার শরীরও হাসে। নারী শরীরের এই পণ্যায়ন দিব্যেন্দু পালিতের 'বিনিদ্র', 'সম্পর্ক', 'অনুভব' প্রভৃতি উপন্যাসেও দেখা যায়।

কংগ্রেস পার্টির কনফারেন্স উপলক্ষে দেওয়া ফুল পেজ বিজ্ঞাপনে কোম্পানির রোজগার পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা। অপরেশ ব্যবসায়ী। সে জানে, কোম্পানির লাভের জন্য একজন দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন। তাই পুরনো দক্ষ কর্মী অপূর্বর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। এর জন্য তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য সীতাকে তার ফ্ল্যাটে পাঠিয়েছে। কিন্তু অপূর্বর

দক্ষতা আর অভিজ্ঞতার কাছে সীতার রূপ আর সৌন্দর্যের কোনো দাম থাকে না। বিউটি প্রোডাক্টসের মার্কেটিং ডিরেক্টর লাডলীমোহন সীতাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়েছে বলে অপরেশ অ্যাকশন গ্রুপ থেকে অবলীলায় তাকে বহিষ্কৃত করেছে। ব্যবসার খাতিরে সীতা বা অপূর্ব দুজনকেই ব্যবহার করেছে অপরেশ। দুজনের মধ্যেই শূন্যতা দেখা দিয়েছে। সীতা নতুন একটি অ্যাডভার্টাইজিং কোম্পানি খুললেও তার ব্যবসা টিকেনি। আত্মহত্যার মধ্যদিয়ে সে মুক্তির পথ খুঁজেছে।

'মধ্যরাত' উপন্যাসের দু-দশক পর দিব্যেন্দু পালিত লেখেন 'স্বপ্নের ভিতর' উপন্যাসটি। উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালে। উপন্যাসটি লেখক উৎসর্গ করেন সাংবাদিক আশীষ বর্মনকে। 'মধ্যরাত'-এ দিব্যেন্দু পালিতের যে অপরিণত বা অসম্পূর্ণ মনোভাব ধরা পড়েছে, 'স্বপ্নের ভিতর' তাঁর সফলতা বা পরিপূর্ণতা প্রকাশ পেয়েছে। 'মধ্যরাত'-এ যে নারী চরিত্রগুলি তিনি অঙ্কন করেছেন সেগুলির মনের গভীরতা খুবই কম। চরিত্রগুলি মনের মধ্যে কোনো প্রভাব ফেলে না। চরিত্রগুলি শুধু নিজেদের কথা বলে গেছে, আনন্দঘন পরিবেশে কাটিয়েছে। কিন্তু 'স্বপ্নের ভিতর' উপন্যাসে চরিত্ররা অনেক বেশি অন্তর্মুখী স্বভাবের। লেখক তাদের অনেক বেশি মনের গভীরের কথা বলেছেন। ফলে কাহিনি বা ঘটনাকে বেশি প্রাধান্য দেননি। মাত্র পাঁচটি ছোটো অধ্যায়ে উপন্যাসটি শেষ করেছেন।

এই উপন্যাসের মূল কেন্দ্রে রয়েছে মেয়েদের থাকার জন্য 'দক্ষিণী' নামক একটি আবাসন। এখানকার মেয়েরাও সবাই পেশাগত দিক থেকে চাকরিজীবী। মেয়েরা স্বাধীনভাবে থেকেছে। কিন্তু আগের উপন্যাসের মেয়েরা যেভাবে নিজেদের কথা একে অপরকে জানিয়েছে। এই উপন্যাসে তারা সহজ সরল হতে পারেনি। নিজেদের কথা অন্যের কাছে প্রকাশ করেনি। সবসময় চরিত্ররা একা একা থেকেছে। নিঃসঙ্গ সময়ে আড়াল খুঁজেছে। অতীত স্মৃতি বারবার মনে করতে গিয়ে মনে আঘাত পেয়েছে। দিব্যেন্দু পালিত নারীমনের অন্তর্জগতকে ফুটিয়ে তোলার জন্যই হয়তো এই উপন্যাসের অবতারণা করেছেন।

সংবাদপত্রের সঙ্গে জড়িত থাকায় দিব্যেন্দু পালিত নিরুদ্দেশ, অপহরণ বিষয়ে কয়েকটি গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। কমবয়সী মেয়ে, নববিবাহিতা যুবতীর অপহরণ স্থান পেয়েছে 'অন্তর্ধান' (১৯৮৯), 'অনুসরণ' (১৯৯০), 'সোহিনী এখন কোথায়' (২০০০) প্রভৃতি

উপন্যাসে এবং 'পুরুষ' গল্পে। এই উপন্যাসগুলিতে দিব্যেন্দু পালিত সংবাদপত্রের কিছু কিছু সংবাদ তুলে ধরেছেন। এতে আমরা তাঁর সাংবাদিক সত্তার পরিচয়ও পাই। যেমন, 'অন্তর্ধান' উপন্যাসের শেষে তিনি বলেছেন—

> "সংবাদপত্রে প্রকাশিত কিছু সংবাদ বিচ্ছিন্ন ও পরিবর্তিতভাবে ব্যবহার করা হলেও এই উপন্যাসের সব চরিত্র এবং যাবতীয় ঘটনাই কাল্পনিক।"[৪৭]

'অন্তর্ধান' উপন্যাসটির মূল বিষয়বস্তু এক অষ্টাদশী তরুণী ইনার (পুতুল) অন্তর্ধান রহস্যকে কেন্দ্র করে। তারপর ইনার পিতা সুশোভনবাবুর মেয়েকে নিরন্তর খোঁজা চলতে থাকে। বড়দাদা হার্ট আট্যাক করার খবরে সুশোভন একমাত্র মেয়ে ইনাকে পাঠিয়েছিলেন খবর নিতে। সেখান থেকে বাড়ি ফেরার পথে সে হারিয়ে যায়। হঠাৎকরে মেয়ের নিরুদ্দেশে সুশোভন এবং তার স্ত্রী লীনা স্তম্ভিত, হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। মেয়েকে খুঁজতে গিয়ে সব রকমের চেষ্টা থেকে ব্যর্থ হন। পুলিস, আইন, সরকারের সবরকম তল্লাশি খুঁজতে ব্যর্থ হয় ইনাকে। পুলিসকে না জানিয়ে প্রথমে উকিল বীরেন দত্তের শরণাপন্ন হন। ইনার বন্ধু টুংকার কাছ থেকে জানতে পারেন বরুণ নামে একটি ছেলের সাথে ইনার অ্যাফেয়ার ছিল। ইনাকে শেষ দেখা গিয়েছিল গড়িয়াহাটের মোড়ে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ। টুংকার দাদা নকুল দেখেছিল বরুণের সঙ্গে একটা ট্যাক্সিতে উঠতে।

এরপর সুশোভনবাবু থানায় ডায়েরি করেন। পুলিস আশ্বাস দেন কয়েকদিনের মধ্যে তার মেয়েকে খুঁজে বের করবেন। কিন্তু এভাবে দু'সপ্তাহ কেটে যায়। কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না ইনার। থানায় বারবার গেলে সুশোভনবাবুকে অপমানিত হতে হয়। পুলিস-প্রশাসনের ব্যর্থতা উপন্যাসে উঠে আসে। সুশোভনবাবু সংবাদপত্রে মেয়ের নিখোঁজের খবরটা দেন— 'অষ্টাদশী তরুণী নিখোঁজ' বলে। কিন্তু এতে তার বিপদ বাড়ে। কেউ বেনামি চিঠি লিখে তাকে ধমকান। হুমকি দেন, মেয়ের ভালো চাইলে যেন তার খোঁজ নেওয়া না হয়।

এই পর্যন্ত উপন্যাসের গতি একটা সরল পথে চলছিল। এরপর শুরু হয় সুশোভনবাবুর মেয়েকে নিরন্তর খোঁজা। সেপথে তিনি একা। কাউকে কিছু না জানিয়ে নিজেই মেয়ের খোঁজে বের হন। জনৈক এক বিশ্বস্ত লোকের সাথে ধানবাদ, জামসেদপুরে

যান। সেখানে গিয়ে বুঝতে পারেন তার মেয়ে যে ছেলেটির সাথে পালিয়েছে সে আসলে একটা কুচক্রের সঙ্গে জড়িত। ছেলেটি তার মেয়ের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছে।

সংবাদপত্রের খবরে আমাদের চমকিত হতে হয়, 'সুশোভন মুখার্জিও হারিয়ে গেলেন?' শুনে মেয়েকে খুঁজতে গিয়ে নিজেও হারিয়ে গেলেন সুশোভনবাবু। আমাদের হতাশ হতে হয় পুলিস-প্রশাসনের ব্যর্থতা দেখে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রদবদল হয় পুলিসে। নতুন অফিসার লোহিত রায় দায়িত্ব নেন। খবরের কাগজে তার সাক্ষাৎকার বের হয়—

> "শুধু এই রাজ্যে বা এই দেশেই নয়, বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই, বিশেষত অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অন্তর্ধানজনিত ঘটনার সংখ্যা বাড়ছে।...অন্তর্ধানজনিত ঘটনার চরিত্রও পাল্টে যাচ্ছে ক্রমশ এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এগুলির সঙ্গে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কারণ জড়িত থাকছে না। অনেক ক্ষেত্রেই এর পিছনে থাকছে বৃহত্তর রাজনৈতিক কিংবা বাণিজ্যিক কারণ।"[৪৮]

'অনুসরণ' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালে। আঠাশ বছর বয়স্কা একজন বিবাহিতা যুবতী এষাকে নিয়ে গভীর রাতে উধাও হয় একটি ট্যাক্সি। ড্রাইভারসহ আরো দুজন সন্দেহজনক চরিত্রের পুরুষ ছিল ঐ ট্যাক্সিতে। উধাও হবার আগে এষার স্বামী অনীশ দত্তকে মারধোর করে ফেলে দেয় রাস্তার ধারের গর্তে। অনীশ দত্ত ঘটনাটি পুলিশের কাছে জানালেও সবার কাছে গোপন রেখেছেন।

দিব্যেন্দু পালিত কাহিনিকে এদিকে না নিয়ে গিয়ে কাহিনির আপতিক প্রভাব ছাড়িয়ে আমাদের সবাইকে নিয়োজিত করেন নিরন্তর অনুসরণের কাজে। যে অনুসরণ একসময় নিজের দিকেই। অর্থাৎ সমাজ-শ্রেণি-সময়ের অনুসরণ। পেশায় সাংবাদিক, মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি অনীশ দত্ত এষার দুর্বৃত্তদের দ্বারা অপহৃত হওয়ার ঘটনাটি খবরের কাগজে দিতে পারতেন। কিন্তু দেননি। আগের রাতের ঘটে যাওয়া ঘটনাটি তিনি এক আঙ্কিক শৃঙ্খলায় ভাবতে থাকেন। যতো সময় যাবে সমস্যা ততোই বাড়বে বলে চিন্তিত হয়ে পড়েন।

> "অনীশ ভাবল, এখন মানেই এই মুহূর্ত। পরের মুহূর্তগুলি সৃষ্টি হবে আরও ব্যাপক সময়ের। এবেলার পর আছে ওবেলা। আজকের পর কাল, তারপর পরশু, এইভাবে।"[৪৯]

তার চলাফেরা, ভাবভঙ্গি বদলাতে থাকে। পুলিস তার কথায় অসঙ্গতি পেলে তার পিছনেই লোক লাগায়, অনুসরণ করে। এষাকে না খুঁজে তাকেই গ্রেপ্তার করে, কোর্টে নিয়ে যায়। অনীশ বুঝতে পারে না, কোন কেসের জন্য পুলিস তাকে গ্রেপ্তার করেছে। বিচারকের সামনে পুলিস কারণ দেখায়—

প্রথমত, এষা দত্ত নিখোঁজ হওয়ার পর তার স্বামী অনীশ দত্ত নিজের আত্মীয় ও পরিচিতদের কাছে নানা ধরনের পরস্পরবিরোধী কথা বলেছে। যেমন, এষা দত্তের শ্বশুর-শাশুড়ি জানতেন না যে তাদের পুত্রবধূ নিখোঁজ হয়েছে। এষার মাকে অনীশ দত্ত বলেছে এষা কয়েকজন বান্ধবীর সঙ্গে শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গেছে।

দ্বিতীয়ত, এইরূপ বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে স্ত্রীর অন্তর্ধান বিষয়ে অনীশ দত্তের কাছে কোনো দুশ্চিন্তা, শোক এবং উদ্বেগ তৈরী হয়নি। বরং স্ত্রী নিখোঁজ হওয়ার পর তার আচরণ ও কথাবার্তায় সেরকম কোনো লক্ষণই প্রকাশ পায়নি।

তৃতীয়ত, এষা দত্তেরই সমবয়সী একজন বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে এইসময় অনীশ দত্তকে ঘনিষ্ঠভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে।

চতুর্থত, অনীশ দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ভিত্তিক রিপোর্টে তিনি কয়েকজন মহিলা এবং পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের উল্লেখ করেন। ঐ রিপোর্টে মধ্য কলকাতার একটি গলির নাম করে সেখানে থাকেন বলে একজন লেডি ডাক্তারের উল্লেখ করেন অনীশ দত্ত। কিন্তু ওখানে কোনো লেডি ডাক্তার ছিলেন না আর ঐ গলিটি দুটি বড়ো রাস্তার মধ্যে সংযোজক মাত্র, ওখানে একটি বস্তি আছে।

অনীশ দত্ত অবশ্য জামিনের আবেদন করেননি। কিন্তু সুবিচারের স্বার্থে তিনি তার বক্তব্য আদালতে পেশ করেন। তিনি জানতে চান, ব্যক্তিগত কারণে গোপনীয়তা রক্ষা ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত কিনা? এষা এখানে দুর্বৃত্তদের দ্বারা অপহৃত— একথা সত্য কিংবা কনসেপ্ট। কিন্তু অনীশ দত্ত নিজেই এক অনুসরণের প্রতীক হয়ে উঠেছেন।

> "গ্রেপ্তার হবার পর থেকে এখন পর্যন্ত যেমন নিরপেক্ষ ছিল, তেমনি নিরপেক্ষভাবেই সে অনুসরণ করল পুলিসকে।"[৫০]

ঘ. চতুর্থ পর্ব ['সংঘাত' (১৯৯২) থেকে 'একদিন সারাদিন' (২০০৩)] :

এই পর্বের উপন্যাসগুলি হলো— 'সংঘাত' (১৯৯২), 'ভোরের আড়াল' (১৯৯৩), 'অনুভব' (১৯৯৪), 'অচেনা আবেগ' (১৯৯৫), 'সেকেণ্ড হনিমুন' (১৯৯৭), 'মৌনমুখর' (১৯৯৮), 'মাত্র কয়েকদিন' (১৯৯৮), 'যখন বৃষ্টি' (১৯৯৯), 'হঠাৎ একদিন' (২০০০), 'সোহিনী এখন কোথায়' (২০০০), 'বহুদূর অভিমান' (২০০২) এবং 'একদিন সারাদিন' (২০০৩)।

সিনেমা, নাটক, থিয়েটার, চলচ্চিত্র প্রভৃতি বিষয়ে দিব্যেন্দু পালিত যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। নির্মাল্য আচার্য্যের সঙ্গে সম্পাদিত চলচ্চিত্র বিষয়ক রচনা 'শতবর্ষে চলচ্চিত্র' (দুই খণ্ড-১৯৯৬ ও ১৯৯৮) প্রবন্ধ গ্রন্থে তাঁর অসাধারণ প্রতিভা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সমালোচক যথার্থই বলেছেন—

> "তিনি দেখেন, শোনেন তো বটেই। কিন্তু সব থেকে বড় কথা তিনি অনুভব করেন গাঢ়, তিনি তাঁর বিষয়ের দিকে তাকাতে তাকাতে চলে যান গভীর থেকে গভীরে। তাঁর লেখায় ভিন্ন মাধ্যমের প্রতি আগ্রহের বিষয়টি আমরা আগেই বলেছি। ফিল্মের পাশে গ্রুপ থিয়েটারও তাঁর আগ্রহের বিষয়।"[৫১]

নাট্যজগৎকে কেন্দ্র করে তিনি দুটি উপন্যাস লিখেছেন— 'সংঘাত' (১৯৯২) এবং 'মৌনমুখর' (১৯৯৮)। 'সংঘাত' উপন্যাসে দল ভাঙা-গড়া, নাটকের মহড়া, উত্থান-পতন ইত্যাদির কথা আছে। আর 'মৌনমুখর' তো একটি নাট্যদলেরই নাম। বিভাস চক্রবর্তী, মনোজ মিত্র, মৃণাল সেন প্রমুখরা এখানে নাটক দেখতে আসেন। শুধু তাই নয়, আনন্দবাজার, স্টেটসম্যান প্রভৃতি পত্রিকায় নাটক সম্পর্কে চমৎকার রিভিউয়ের কথাও উঠে আসে। নাট্য জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের স্বাদু উপস্থিতি এই উপন্যাসের সম্পদ। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা, এই উপন্যাসে নাটক থেকে জীবন, জীবন থেকে নাটকে অনায়াস যাতায়াত চলতে থাকে।

'সংঘাত' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ঋতুপর্ণা সংসারকে আর্থিক সংকট থেকে মুক্ত করতে নাটকে অভিনয় করে। একদিকে সংসার আর একদিকে নাটক— এ দুইয়ের মাঝখানে তার মধ্যে চলতে থাকে মানসিক দ্বন্দ্ব। সংসারকে বাঁচাতে নাটক ছেড়ে একসময় তাঁকে পেশাদারি থিয়েটারে যোগ দিতে হয়। কিন্তু তার ভালোলাগার প্রাণকেন্দ্র নাট্যজগৎ।

অর্থের প্রয়োজনে শিল্পীর শিল্পসত্তা নষ্ট হতে থাকে এখানে। 'মৌনমুখর' উপন্যাসেও অন্যতম চরিত্র ব্রততী অর্থের মোহে নাটক ছেড়ে একসময় টিভি সিরিয়ালে নাম লিখিয়েছিল।

বিশ শতকের সাত-আটের দশক থেকে বাজার অর্থনীতি সমাজকে গ্রাস করেছিল। ফুটপাত জুড়ে বসা শুরু করেছিল এই বাজার অর্থনীতি। কোনোকিছুই এই গ্রাস থেকে মুক্ত হতে পারেনি। শিল্পের জগৎও এর থেকে বাদ পড়েনি। ছোটো-বড়ো যে কোনো নাট্যদলই পেশাদারি থিয়েটার বা সিনেমার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। শিল্পের জগতে নতুন নতুন মুখ প্রতিমুহূর্তেই পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় মেতেছে। সিরিয়াল কিংবা সিনেমার সঙ্গে গ্রুপ থিয়েটারের শিল্পীদের অভিনয়ের দ্বন্দ্ব 'মৌনমুখর' উপন্যাসে লেখক দেখান। অন্যদিকে নাটককে কেন্দ্র করে একশ্রেণির মুনাফালোভীর দলও গড়ে উঠেছিল। সরোজ কিংবা অশোকের কাছে শিল্পের কোনো মূল্য নেই, মুনাফা অর্জনের জন্য তারা প্রতি মুহূর্তে শিল্পীকে কাজে লাগিয়েছে। ব্যক্তিগত মুনাফালাভের জন্য সরোজ নারীর চেহারা, সৌন্দর্য অর্থদিয়ে কিনে নিতে চেয়েছিল। নিজের কমার্শিয়াল নাটকে সে আরো জনপ্রিয় করে তুলতে চেয়েছিল। সিগারেট ব্যবসায়ী অশোক তার স্ত্রীকে নাটকের জগতে এনে ব্যবসা করতে চেয়েছিল। নাট্যশিল্পী ব্রততী এই সব ব্যবসায়িক ব্যক্তির কাছে বিভ্রান্তে পড়েছিল। অর্থের মোহে পড়ে সে নিজের খ্যাতিকে নষ্ট করে ফেলেছিল। নিজের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল। গ্রুপ থিয়েটার থেকে টিভি সিরিয়ালের দিকে ঝুঁকেছিল। কিন্তু টিভি সিরিয়ালে ব্রততীর ব্যক্তিগতভাবে ভালো লাগেনি। সেখানে জীবনের স্পন্দন খুঁজে পায়নি। স্বামীর মুনাফালাভকে ফেলে চলে আসে। গ্রুপ থিয়েটারে ফিরে আসতে চায় আবার। মনে পড়ে যায়, গ্রুপ থিয়েটারে নাটকের জন্য শিল্পীর ভালোবাসা, আবেগ, আত্মত্যাগকে। শিল্পের সঙ্গে শিল্পীর জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে এখানে।

এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র তড়িৎ, একজন নিবেদিতপ্রাণ নাট্যকর্মী। সে থিয়েটারকে কখনোই টিভি সিরিয়াল বা ফিচার ফিল্মে পৌঁছবার মাধ্যম হিসেবে দেখেনি। থিয়েটার তার কাছে একটা আলাদা প্ল্যাটফর্ম, অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েও সে নাটককে ছাড়েনি। তার চোখের সামনে অন্য নাট্যকর্মীরা গ্ল্যামার, অর্থের মোহে দিগভ্রান্ত হয়ে গ্রুপ থিয়েটার ছেড়ে চলে গেছে। থিয়েটার চালানোর মতো সাংগঠনিক বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে তড়িৎ। একসময় ভেঙে যেতে থাকে সে। কিন্তু দ্রুত সাফল্য আর সিরিয়াল-সিনেমায় চান্স

পাওয়ার জন্য সে কোনোদিন আগ্রহ দেখায়নি। সহজসরল গতিতে, বহু উত্থানপতনকে অঙ্গীকার করেই সে লড়ে গেছে আজীবন। থিয়েটার তার জীবনচর্চা। শুধু সাফল্য আর আত্মতৃপ্তিতে সে নিমগ্ন থাকেনি। নাটক তার স্বপ্ন আর তৃষ্ণা বুনে দিয়েছে।

টিভি-সিরিয়াল টাকা দেয়, এক্সপোজার দেয়— এটাতেই অনেকের মোক্ষ। অথচ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আর্টের আশপাশ দিয়েও পথ হাটে না টিভি-সিরিয়াল। দিব্যেন্দু পালিত খুব সুন্দরভাবেই তার নিজস্ব মনোভাব উপন্যাসের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। আলো কিংবা মঞ্চনির্মাণ প্রসঙ্গেও দিব্যেন্দু পালিতের গভীর জ্ঞান উপন্যাসে ফুটে উঠে। যেমন, একটি লাইন— "আলো বাউন্স পাওয়ার জন্যে চওড়া কাঠে সাদা রঙ লাগাচ্ছে তমাল।"[৫২] কিংবা "বিভাস বললেন, লাইটের ব্যাপারে আর একটু ভাবো। দু'এক জায়গায় ভুল এমফ্যাসিস পড়ছে মনে হল। ওই যে ব্রততীর 'তোমাকে চিনতে পারছি না কেন-কেন-কেন' ওখানে তোমাকে ধরেছে একটু দেরিতে। আগে ব্রততী, পরে তড়িৎ— এরকম ডিভিশন হবে কেন? লাইটও ইন্টার অ্যাক্ট করুক'।[৫৩]

দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে মেয়েরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বন্ধন থেকে বেরোতে চেয়েছে। মাতৃত্বে নয়, পত্নীত্বে নয়, নারীত্বেই তাদের নিজের পরিচয় খুঁজতে চেয়েছে। এ খোঁজা যে সবসময় সফল হয়েছে তা নয়। কিন্তু এই খোঁজার মধ্যেই তাদের চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়েছে। 'আড়াল' কিংবা 'অবৈধ' উপন্যাসের রুচি কিংবা জিনা এই আত্ম-আবিষ্কারের প্রবল তাগিদেই হয়ে উঠেছে বিদ্রোহী। কিন্তু সমাজের ব্যাধি তাদের সফল হতে দেয়নি। বরং পরবর্তীতে লেখা 'স্বপ্নের ভিতর' (১৯৮৬), 'সংঘাত' (১৯৯২) এবং 'অনুভব' (১৯৯৪) উপন্যাসে মেয়েদের দিব্যেন্দু পালিত বেশি স্বাধিকার দিয়েছেন। স্বনির্ভর এবং স্বাধিকার পেতে চাওয়া মেয়েরা আলাদা জমি খুঁজেছে নিজেরা দাঁড়াবার জন্য, বাঁচবার জন্য। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হয়েছে মেয়েরা। ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসার ফলে অসুবিধা হয়েছে ঠিকই কিন্তু অদম্য আত্মবিশ্বাস তাদের পৌঁছে দিচ্ছিল কোথাও, যেখানে তারা অন্যের জন্য কেবল নিজের হাতই বাড়িয়ে দেয়নি, বাড়িয়ে দিয়েছিল আশ্বাসের হাতও।

দিব্যেন্দু পালিতের লেখায় নারী ও পুরুষ— উভয়ের সংকট তীব্রভাবে এসেছে। মেয়েরা তো প্রথানুগ খেলার পুতুল নয়ই, বরং সময়ের প্রেক্ষাপটে নানা সংঘাতের মধ্যে তারা লড়াই করে বেঁচে থাকে। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে হেরে যাওয়াকে জীবনের শেষ বলে

দেখাতে চাননি লেখক। মেয়েদের বাঁচাতে, জীবনযুদ্ধে টিকে থাকতে নতুন নতুন পথ দেখিয়েছেন তিনি। 'সংঘাত' (১৯৯২) উপন্যাসে এরমকমই একটা বিষয়কে তুলে ধরেছেন লেখক। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ঋতুপর্ণার জীবন সংগ্রাম আমাদের মধ্যে সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস তৈরী করে দেয়। বিয়ের দুমাস পরে বিধবা হয়ে অভাবের সংসারে ফিরে আসতে হয় তাকে। অসুস্থ বাবার চিকিৎসা আর সংসারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেয়। সামান্য বেতনের একটি পার্ট-টাইম চাকরি পায় স্কুলে। কিন্তু তাতে সংসারের অর্ধেকও চলে না। থিয়েটারে অভিনয় করে বাকিটা পূরণ করে।

অফিস থিয়েটারের কিংবা গ্রুপ থিয়েটারের মহড়া দৃশ্যের ফাঁকে ফাঁকে লেখক দেখিয়েছেন মধ্যমগ্রামের নিম্নবিত্ত একটি পরিবারের জীবননাট্যের কয়েকটি দৃশ্য। অভিনয় করে বেশি রাতে অন্য পুরুষের সাথে বাড়ি ফিরলেও তার মা ভারতী দেবী তাকে কোনো প্রশ্ন করে না। বরং বলে, "তোর বাবার চশমার পাওয়ারটা বোধহয় বেড়েছে। সামনের মাসে একটা চশমা করিয়ে দিস তো!"[৫৪] তার মা সম্ভবত ভেবেছিল উপার্জনের টাকা টাটকা থাকতে থাকতেই দাবিটা জানিয়ে রাখা দরকার। এইভাবেই অর্থ চেনায় সম্পর্ককে। সদ্য যুবতী ছোটোবোন সুপর্ণার উগ্র সাজকে ধমক দিলে সে-ও বলে ওঠে, 'বিধবা হয়ে তুমি সাজতে পারো, আমি পারি না কেনো!' এর সঙ্গে যুক্ত হয় তার মায়ের মন্তব্য, 'যা দেখছে তাই শিখছে! ওর আর দোষ কী'। ঋতুপর্ণার কিছু বলার থাকে না। দর্শকহীন নাটকের শেষ দৃশ্যের মতো নিজের ভূমিকাটা সে বোঝে।

এই উপন্যাসের পটভূমি কলকাতা ও মধ্যমগ্রাম। তবে পরিবার আর নির্দিষ্ট কয়েকটি চরিত্র ছাড়া পরিপার্শ্ব তেমন স্পর্শ করেনি এর কাহিনিকে। অন্তত অভিনেত্রী ঋতুপর্ণাকে পাড়াপড়শির কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে হয়নি কাউকে। লেখক এখানে দেখিয়েছেন শিল্প আর শিল্পী কীভাবে এক হয়ে যায়। জীবনের সংঘাত কীভাবে কখনো কখনো মূর্ত হয়ে ওঠে শিল্পের শিরোনামে। তিন স্তরে তিন অঙ্কে 'সংঘাত' নাটকে সীতার নারীজীবনের পঞ্চাশটি বছর দেখান নাট্যকার মৃণালবাবু। সাধারণ এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত যুবতী থেকে স্ত্রী হয়ে মা, তারপর বিধবা হয় সে। ঘর ও বাইরের টানাপোড়েনে বিপর্যস্ত হতে হতে প্রৌঢ়া, তারপর বৃদ্ধা হয়। পঞ্চাশ বছরে তাকে ঘিরে সংসারের চেহারাই শুধু পাল্টায় না। নানা আর্থ-

সামাজিক, রাজনৈতিক সংঘাতের মধ্যদিয়ে পাল্টে যায় দেশের ইতিহাসও। উপন্যাসের নায়িকা ঋতুপর্ণারও জীবন কাহিনি অনেকটা এইরকম।

দিব্যেন্দু পালিতের 'অনুভব' উপন্যাসটির রচনাকাল ১৯৯৩ সাল। উপন্যাসটি ১৯৯৮ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পায়। এই উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র আত্রেয়ী। আত্রেয়ীর লন্ডনে বিয়ে হওয়ার পর সে বুঝতে পারে তার স্বামী অন্য নারীর প্রতি আসক্ত। অপমানিত হয়ে দেশে ফিরে আসে। শুরু হয় অপূর্ণতা, নিঃসঙ্গতা ও অনিশ্চয়তায় আক্রান্ত তার বদলে যাওয়া জীবন। আগের জীবন আর ফিরে আসে না। বাড়ির লোকজনও আগের মতো আর ব্যবহার করে না। তার নিজের মা'ও বলে, আত্রেয়ীর এই অবস্থা হলে বিয়ের আগেই বাড়ির প্ল্যানে আর একটা ঘর রাখতো। বোনের রুমে তাকে থাকতে হতো। বোনরাও অনেক সময় অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে, তাই বাড়ির বাইরেও বের হয় না। আসলে মধ্যবিত্ত পরিবারে লোকসংখ্যা বেশি হওয়ায় অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। আত্রেয়ী বুঝতে পারে নিজেকে টিকে রাখতে গেলে স্বাবলম্বী হতে হবে। তাই বিভিন্ন কোম্পানিতে চাকরির জন্য অ্যাপ্লিকেশন করে। দাদার বন্ধু উৎপল এই সময় তার জীবনে দেবদূত হয়ে আসে। সেই একমাত্র ভরসা। অবশেষে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টায় সে একটি রিসার্চ এজেন্সিতে চাকরি পেয়ে যায়। সেখানে বিশ্বের সর্বত্র মেয়েদের কীভাবে বাধ্য করা হচ্ছে পতিতা বা কলগার্লের বৃত্তিতে তার রিপোর্ট তাকে তৈরী করতে হয়। এইভাবে রিসার্চ রিপোর্টের মধ্যদিয়ে এগোতে এগোতে একটা সময় আসে রিপোর্টের বিভিন্ন মেয়ের সঙ্গে তার জীবনের বাস্তবের কিছু কিছু ঘটনা মিলে যাচ্ছে। সে যদি আর একটু এগোয় তাহলে সেও এদের দলেই পড়বে। যখন দেখে নির্যাতিতাদের শোষণ করা হচ্ছে বা তাদের প্রয়োজনের সুযোগ নিয়ে দেহদানে বা বিক্রয়ে বাধ্য করা হচ্ছে মেয়েদের তখন তার মধ্যে একটা প্রতিবাদ জেগে ওঠে। সে রিসার্চ এজেন্সির চাকরি থেকে ইস্তফা দেয়।

এই বিষয়টা বাংলা সাহিত্যে নতুনত্বের স্বাদ এনেছিল। সাহিত্য অকাদেমির প্রস্তাবে এই উপন্যাস সম্পর্কে বলা হয়েছে উপন্যাসটি বাংলায় লেখা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এটি হিন্দি, তামিল, তেলেগু, গুজরাতি ইত্যাদি যে কোনো ভাষাতেই লেখা হতে পারতো। এমনকি যে কোনও বিদেশি ভাষাতেও লেখা যেত। কারণ এর বিষয়টা এতোই সর্বজনীন ও সামগ্রিক।[৫৫] এর কাহিনিতে এক জায়গায় ইউনেস্কোর একজন ডিরেক্টর মিসেস তামজালির দীর্ঘ বক্তৃতার

মধ্যদিয়ে দিব্যেন্দু পালিত তৃতীয় বিশ্বের এক ক্রমবর্ধমান সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। এশিয়া, লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে যেভাবে দেহোপজীবিনীদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে এবং বৃত্তিটাকে যেভাবে টিঁকিয়ে রাখা হয়েছে, তাতে সুস্থ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা ভাবা ও সমাধান করা উচিত। মিসেস তামজালি এখানে দেশ-বিদেশে নির্যাতিত, ধর্ষিত মেয়েদের যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তা চিনিয়ে দেয় আমাদের সভ্যতার তথাকথিত প্রগতিকে।

সিমার্‌স্‌-এ যে প্রোজেক্টে কাজ করেছিল আত্রেয়ী তা হলো কলকাতার দেহোপজীবিনীদের নিয়ে একটি সমীক্ষা— তারা কোন আর্থ-সামাজিক শ্রেণিতে পড়ে, কোন অবস্থায় তারা এই পেশা বেছে নিয়েছে ইত্যাদি। লেখক সাধারণ একটি মেয়ের স্বাবলম্বী হওয়ার কথা বলতে গিয়ে পাঠকের অনুভবকে বিদ্ধ করেন। প্রশ্ন তুলেন, "মানুষের ইতিহাস, সভ্যতা, মানবিকতা, নীতিবোধও অগ্রগতির দাবি করে, কিন্তু ঘটনাচক্রে দেখা যাচ্ছে, এই একটি ক্ষেত্রে নারীর অসহায়তা, নারীকে হৃদয়, বোধ, অনুভূতি বর্জিত শুধু ধর্ষণের বস্তু হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতা অতীতের ঘটনার তুলনায় একেবারেই কমেনি।"[৫৬]

'অচেনা আবেগ' (১৯৯৫) দিব্যেন্দু পালিতের এক অসামান্য প্রেমের উপন্যাস। তিন বছর প্রেম করার পর শমিতা হঠাৎ জানতে পারে তার প্রেমিক জয়দীপের আগেই এক বিয়ে হয়ে গেছে এবং এক সন্তানও আছে। জয়দীপের স্ত্রী বন্দনার আবির্ভাবে শমিতা জানতে পারে জয়দীপ তার কাছে নিজের আত্মপরিচয় গোপন করেছে। এই প্রবঞ্চনা সহ্য করতে না পেরে জয়দীপকে সে প্রত্যাখ্যান করেছে। এরই কিছুদিন পরে টেলিফোনে খবর পায় এক ভোররাতের অদ্ভূত পরিবেশে জয়দীপ আত্মহত্যা করেছে। এখানেই উপন্যাসের কাহিনি শেষ হয়ে যেতে পারতো। "কিন্তু, প্রায় অভাবনীয় তাৎপর্যে শেষের পরেই শুরু হয়েছে এই অসামান্য প্রেমের উপন্যাস : অচেনা আবেগ— যেখানে স্মৃতি ও নিঃসঙ্গতার অন্তর্লীন অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে ক্রমশ আবেগের পূর্ণতায় পৌঁছে যায় শমিতা, ফ্রেমে বাঁধানো ছবির সাদৃশ্যে মৃত্যু ও জীবন ছুঁয়ে থাকে পরস্পরকে।"[৫৭]

উপন্যাসে লেখক শমিতার প্রেমের মহত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একান্নবর্তী পরিবারের মেয়ে শমিতা। সরকারী অফিসে চাকরি করে পরিবারের ভার সেও কিছুটা নিয়েছিল। তাই নিজের পছন্দ মতো জীবনসঙ্গী খুঁজে নিতে তার কোনো অসুবিধা হয়নি। যত্রতত্র যাওয়ার কোনো বিধিনিষেধ ছিল না। বাড়িতে বিয়ের কথা বলেছিল। অনেক দূর

এগিয়েও ছিল। শমিতা জয়দীপের উপর নির্ভর করে নতুন নতুন স্বপ্ন দেখেছিল। জয়দীপ পেশায় অফিসকর্মী হলেও সে ছিল আর্টিস্ট। ভালো-মন্দ বিচার আর অনুভূতির জগৎটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। অতীত আর ভবিষ্যৎকে ভুলে সে বর্তমানকে বেশি বিশ্বাস করতো। বর্তমানের ভালোবাসাকে গুরুত্ব দিয়েছিল বলে প্রথম পক্ষের স্ত্রী আর সন্তানের কথা জানায়নি। সে চেয়েছিল বিয়ে করে শমিতাকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যাবে।

জয়দীপ ধুতি, পাঞ্জাবি পড়ে বরের বেশে আত্মহত্যা করেছিল। সে মরে গিয়ে বোঝাতে চেয়েছিল তার ভালোবাসায় কোনো খাদ ছিল না। আর ভালোবাসার এই আবেগকে আঁকড়ে ধরেই শমিতা বাকি জীবনটা কাটাতে চেয়েছিল। তাই বাড়িতে যখন আরো বিয়ের খবর আসে সে নিজেকে 'বিধবা' বলে দেয়। এমনকি আর এক পুরুষ অফিসের বস দেবপ্রিয় তার কাছে আসতে চাইলে সে না নাকচ করে দেয়। জয়দীপের ভালোবাসা, শরীরী আকর্ষণ শমিতা কোনোদিনই ভুলতে পারেনি। তার এই ব্যক্তিগত আবেগ কাউকে বলতেও চায়না। তার মনে হয়, "কিছু সত্য থাকে যা ব্যক্তিগত, শুধু অনুভূতিতে জড়ানো... যা নিজের মধ্যেই আড়াল করে রাখতে হয়।"[৫৮]

জয়দীপের মৃত্যুর পর তাকে ঘিরে সেসব স্মৃতি সবসময় এক অচেনা আবেগে আচ্ছন্ন করে রাখে শমিতাকে। একসময় ভাবে জয়দীপের মৃত্যুর জন্য বন্দনাই দায়ী। কেন সে তাদের সম্পর্কে ঘি ঢালতে এসেছিল। কেন দেখাতে এসেছিল ডিভোর্সি সার্টিফিকেট আর ছেলে কোলে নেওয়া জয়দীপের ছবি। না হলে তাদের সম্পর্ক ভাঙত না আর জয়দীপ বেঁচে যেত। সাময়িকভাবে ভেঙে পড়ে সে। তার অভাববোধ, অপরাধবোধ— যেভাবেই ভাবুক না কেন শমিতা আজকে একা হয়ে পড়েছে। বাস্তব তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। তাই উপন্যাসের শেষে তার উক্তি—

> "যতদিন যাচ্ছে ততই তোমাকে জড়ানো আমার অনুভূতিগুলো কীরকম তীব্রতায় ফিরিয়ে আনছে আমার মধ্যে! দেখছ না, কীভাবে ভরে উঠছে তোমার পাশের শূন্যতা!"[৫৯]

দুই বিবাহিত নারী ও পুরুষের গোপন প্রেমের সম্পর্কের কুশলী উন্মোচন দিব্যেন্দু পালিতের 'মাত্র কয়েকদিন' (১৯৯৮) এবং 'হঠাৎ একদিন' (২০০০) উপন্যাস। বিয়ে করে

ছেলে অন্যত্র চলে গেলে অদিতি একা হয়ে পড়ে। বিয়ের পর স্বামী আর স্বামী মারা যাওয়ার পর ছেলের উপর নির্ভর করে বাঁচতে চেয়েছিল অদিতি। কিন্তু ছেলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিয়ের পর বাড়ি বদল করে অন্যত্র চলে যায়। শুরু হয় অদিতির নিঃসঙ্গ জীবন। একাকীত্ব গ্রাস করে চারিদিকে। একা, স্বজনহীন, নিঃস্ব এবং নিঃশেষিত— এই আবর্তের ঘূর্ণিপাকে অদিতির মনে হয়েছিল এভাবে বেঁচে থেকে লাভ কী? সে চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে একটা আশ্রয়, একটা অবলম্বন চেয়েছিল। যা কেবল অন্য পুরুষ দিতে পারে। আকস্মিক দুর্ঘটনায় বিষ্ণুর মৃত্যুর পর অদিতি আর তার ছেলের প্রতি একসময় দায়িত্ববান হয়ে উঠেছিল বিষ্ণুর বন্ধু প্রিয়ব্রত। প্রিয়ব্রতর কাছেই সে অবলম্বন চেয়েছিল, প্রিয়ব্রতও ফিরিয়ে দেয়নি। নিজের অপূর্ণ জীবনের ক্ষোভ ও অভিমান সব মিলিয়ে দিতে চেয়েছিল প্রিয়ব্রতর সান্নিধ্যে এসে। কিন্তু পারস্পরিক আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও অদিতি স্বামীর স্মৃতি আর পুত্রের প্রতি ভালোবাসাকে অস্বীকার করেনি। তাই প্রিয়ব্রতর কাছ থেকে দূরে সরে এসেছিল। প্রিয়ব্রতও অদিতির উপর নিজের অধিকার আরোপ করতে পারেনি। হঠাৎ শুরু হয়ে হঠাৎই যেন শেষ হয়ে যায় অদিতি আর প্রিয়ব্রতর সম্পর্কের পূর্ণতার সম্ভাবনা। পূর্ণতার তাৎপর্য তাদের কাছে অন্যভাবে ধরা দিয়েছে।

> "নিজেদের জন্যে কবেই আর কী ছিল আমাদের! তবু আমরা তো আমাদের মধ্যেই ছিলাম— সেই কোন যুগ থেকে এতগুলো বছর! দুঃখ নিয়ে, বাঁধা নিয়ে, দূরত্ব নিয়ে এইভাবেই কি কাছাকাছি থাকতে পারব না বাকি দিনগুলো!"[৬০]

দুই প্রাপ্ত বয়স্ক নরনারীর জটিল অথচ তীব্র মানবিক সম্পর্ক আশ্চর্য নৈপুণ্যে উদ্ঘাটিত করেছেন লেখক তাঁর এই ভিন্ন স্বাদের উপন্যাসে।

'হঠাৎ একদিন' উপন্যাসেও লেখক প্রেমের এক অন্য মাত্রাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আমেরিকায় একটা ফটোগ্রাফির পুরস্কার আনতে গিয়ে শ্রীজিতের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় কলকাতার এক খবরের কাগজের সিনেমা-সাংবাদিক আনন্দকমলের স্ত্রী অনুজার। শুরু হয় তাদের অবৈধ প্রেমের খেলা। নায়গ্রা জলপ্রপাতে 'মেড অব দ্য মিস্ট' ট্যুরের অতি সুন্দর পটভূমিতে দুজনের সেই আকস্মিক পরিচয় এমনই এক বন্ধনে জড়িয়ে ফেলে যে কলকাতায় ফিরেও চলতে থাকে তাদের উদ্দাম লুকোচুরি খেলা। অনুজা বুঝতে পারে না তাদের এই আকর্ষণটা শুধুই শারীরিক কি না। অবৈধ, অসামাজিক জেনে শ্রীজিতকে তার শরীর

ব্যবহারের সুযোগ দিলেও, মন দেয়নি। শ্রীজিতের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক সত্ত্বেও সে তার স্বামী আনন্দকমলকেই ভালবাসে। শ্রীজিতের উদ্দাম আকর্ষণ টানেও সে কখনো আনন্দকমলকে ছেড়ে যেতে চায়নি। আনন্দকমলের ভালোবাসাও তার কাছে মিথ্যে হয়ে ওঠেনি।

চরিত্রে কিছুটা লাগাম ছাড়া হলেও নামকরা ফটোগ্রাফার শ্রীজিতও তার স্ত্রীর প্রতি এমন কোনো অবহেলা দেখায়নি। যার ফলে পরবর্তীতে তার স্ত্রী বিপাশা কোনো অনুযোগ করতে পারে। সেজন্য সেও বিপাশাকে ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবেনি। প্রায় অহেতুক একটি সম্পর্কের টানাপোড়েনে তীব্র এই কাহিনি প্রেম ও প্রেমহীনতার এক আপাত-ধূসর আখ্যান, হয়তো তা থেকে উত্তরণও।

স্ত্রী অপহরণ নিয়ে লেখা দিব্যেন্দু পালিতের আর একটি উপন্যাস 'সোহিনী এখন কোথায়' (২০০০)। উপন্যাসটি 'অনুসরণ' উপন্যাসের কিছুটা পরিবর্তিত রূপ। মনস্তত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করার জন্য লেখক কাহিনি ও চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। 'অনুসরণ' উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র অনীশ ও এষার বদলে 'সোহিনী এখন কোথায়' উপন্যাসে ধীমান ও সোহিনীকে এনেছেন। অনীশের মধ্যে যে দ্বিচারিতা দেখা গিয়েছিল, ধীমানের মধ্যে তা আরো প্রবল হয়ে উঠেছিল। এষা আর সোহিনী— দুজনেই উপন্যাসের কেন্দ্রে থেকেও উপলক্ষমাত্র।

এই উপন্যাসেও দেখা যায় শুরুতেই সোহিনীকে কয়েকজন দুষ্কৃতি অপহরণ করে নিয়ে গেছে। যথেষ্ট গোপনীয়ভাবে ধীমান সেই রাত্রেই থানায় ডায়েরি করে। অনীশের মতো ধীমানও একটি সংবাদপত্রে কাজ করে ঠিকই কিন্তু অপহৃত স্ত্রীর খবরটা সংবাদপত্রে ছাপায়নি। স্ত্রীকে খোঁজা বাদ দিয়ে সংবাদপত্রের ঘটনাগুলিকে পরপর বিশ্লেষণ করে। মিলিয়ে নিতে চায় নিজের জীবনের ঘটনাগুলির সঙ্গে। চিকিৎসার খরচ মেটাতে না পেরে এক প্রৌঢ় দম্পতি আত্মহত্যা করেছেন। কোন ডাক্তার তাদের চিকিৎসা করেছিলেন সেই তথ্যটি খবরের কাগজে না থাকায় সে বিপন্নবোধ করে। আরো বিপন্ন হয়ে পড়ে খবরের কাগজে টিভিস্টার নিশা দত্তের সুইসাইডের খবরটি প্রৌঢ় দম্পতির খবরের থেকে বেশি বড়ো করে ছেপেছে বলে। এই উপন্যাসে অনীশের আত্মদ্বন্দ্বকেই লেখক বেশি করে ফুটিয়ে তুলেছেন।

দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন বিষয়ক উপন্যাস 'সেকেন্ড হনিমুন' (১৯৯৭)। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শিলাজিৎ আর সুপর্ণার আঠারো বছরের দাম্পত্যজীবন ভেঙে যায়

পারস্পরিক সন্দেহের কারণে। শিলাজিৎ মদ্যপ, তাস খেলে, অন্য মেয়ের প্রতিও তার আসক্তির শেষ নেই। এই সব জানার পর শিলাজিতের সঙ্গে সুপর্ণার নিত্য ঝগড়া, কথা কাটাকাটি, এমনকি শিলাজিৎ সুপর্ণার গায়ে হাতও দিয়েছিল। উপন্যাসে জটিলতার সৃষ্টি হয় সুপর্ণা আর অভিমন্যুকে ঘিরে। চাকরিজীবী সুপর্ণার অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে দেরি হয় এবং তাকে ড্রপ করে দেয় অভিমন্যু। এই দৃশ্য দেখার পর শিলাজিৎ স্থির থাকতে পারেনি। সুপর্ণার সঙ্গে অভিমন্যুর অবৈধ সম্পর্কের কথা শিলাজিৎ অফিসের কলিগ, এমনকি তার বোন দেবজানীর কাছে পূর্বেও শুনেছিল। সেই রাতে শিলাজিতের ক্রোধ শারীরিক হয়ে ওঠে। অপ্রত্যাশিতভাবে সুপর্ণাও পাল্টা আঘাত করে। এবং মধ্যরাতে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে এক গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে। আঠারো বছরের দাম্পত্য সম্পর্ক নিমেষেই ভেঙে যায়। আসলে 'আঠারো বছরের গড়ে ওঠার মধ্যেই থেকে যায় ভাঙার উপলক্ষ, সম্পর্কজনিত অভ্যাসের মধ্যে ধরা পড়ে না ভিতরের ক্ষয়। আস্তে আস্তে ছড়ায়। হঠাৎ আঘাতের ধকল সহ্য করতে না পেরে মট করে ভেঙে যায় একদিন।"[৬১]

ষোলো-সতেরো বছরের দাম্পত্যসম্পর্ক যদি হঠাৎ করে ভেঙে যায়— একথা শুনে অনেকে হাসবে, আবার অনেকে আঘাত পাবে। এই আশঙ্কা থেকে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদের ঘটনা প্রফেসর দেবমাল্য আর শ্রেয়া সবার কাছ থেকে আড়াল করতে চেয়েছে। তাদের একমাত্র কিশোরী মেয়ে রিয়াকে জোর করে হস্টেলে পাঠিয়েছে। সম্পর্কের শিকড় এতোটাই আলগা হয়ে গেছে যে কোর্টের রায় বেরোবার আগেই পরস্পরের থেকে আলাদা থেকেছে। কিন্তু একবারও ভেবে দেখেনি পরস্পরের প্রতি অসহিষ্ণুতা, ঈর্ষা, সন্দেহ থেকে যে-বিচ্ছেদের শুরু, তার মূলে কতোটা সত্য আর কতোটা অনুমান— এই বিচ্ছেদ তারা নিজেরাই সহ্য করতে পারেনি। ফলে উভয়ে অতীত স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে মানসিক যন্ত্রণায় ভুগেছে। দেবমাল্য অনুতপ্ত হয়েছে—

> "যখনই নিজেদের ভেঙে যাওয়া সম্পর্কটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে, তখনই অবধারিতভাবে মনে পড়ে সতেরো বছরের টুকরো টুকরো অনেক ঘটনা যার মধ্যে সুখ ছাড়া কিছু নেই। তখন অনুতপ্ত লাগে নিজেকে, কখনওবা আচ্ছন্ন হয়ে যায় দৃষ্টি, মনে হয় ইচ্ছে করলেই এই বিচ্ছেদ এড়ানো যেত।"[৬২]

পরাগের সঙ্গে শ্রেয়ার সম্পর্ক নিয়ে সন্দেহ করেছিল দেবমাল্য। আর রণিতার সঙ্গে দেবমাল্যর অ্যাফেয়ার চলছিল এই নিয়ে সন্দেহ করেছিল শ্রেয়া। কিন্তু কাউকে পছন্দ করা বা কারো সঙ্গে একটু বেশি মেলামেশা করলে এই রকমের সন্দেহ হয়েছে দুজনের, পরে তা উভয়েই বুঝতে পেরেছে। সেপারেশনে থাকলেও শ্রেয়া এখনো তার স্ত্রী। কথাবার্তা এবং যোগাযোগ থাকলেও দেবমাল্য বুঝতে পারে যতো দিন যাচ্ছে ততোই একান্ত হতে হতে ইচ্ছেগুলো হারিয়ে ফেলছে ক্রমশ। অপরদিকে তাদের সম্পর্কের অবনতির ফলে তাদের মেয়ে রিয়াকে 'ভিক্টিমাইজ্ড' হতে হয়েছে। তবে রিয়ার 'সেনসিটিভ' মনকে লেখক এখানে তুলে ধরেননি। 'বহুদূর অভিমান' (২০০১) উপন্যাসে রাজদীপের মধ্যে দিয়ে সেই 'সেন্সিটিভ' কিশোর মনকে লেখক তুলে ধরেছেন।

বিবাহ বিচ্ছিন্ন বাবা-মার কাছ থেকে ক্রমশ দূরে চলে যেতে থাকে রাজদীপ। বাড়িতে থাকার সময়ই বাবা-মার সম্পর্কের অবনতিটা টের পেয়েছিল। কখনো কখনো রিঅ্যাক্টও করতো। একবার বাবা-মার কথা কাটাকাটি উত্তাল হয়ে উঠলে সে ফল কাটার ছুরি নিয়ে তাদের বেডরুমে ঢুকে পড়েছিল। ঐদিনের পর রাজদীপের সামনে ব্রতীন আর অনিশা ঝগড়া করেনি।

'যখন বৃষ্টি' উপন্যাসে রিয়াকে তার বাবা-মা 'সেপারেশন'-এর কথা গোপন রেখেছিল। রিয়ার পড়াশুনার কোনো ক্ষতি যেন না হয় তাই মাঝে মাঝে দেখা করতে গিয়েছিল রিয়ার হস্টেলে। পরবর্তীতেও মেয়েকে আঘাত না দেওয়ার জন্য দেবমাল্য আর শ্রেয়া দ্বিতীয় বিয়ের কথা ভাবেনি। কিন্তু 'বহুদূর অভিমান' উপন্যাসে 'সেপারেশন' পর্ব থেকেই বাবা-মা'র স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে— এটা বোঝানো হয়েছিল রাজদীপকে। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে রাজদীপকে আশ্বাস দিয়েছিল স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হলেও রাজদীপের কাছে তার বাবা-মার সম্পর্ক একই রকম থাকবে। কিন্তু জীবন ও সম্পর্কে জড়ানো এই উপন্যাসের চরিত্ররা ইতিমধ্যেই সরে এসছে তাদের নির্দিষ্ট অবস্থান থেকে। আলগা হয়ে গেছে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কগুলো। অনিশার সঙ্গে ব্রতীনের সম্পর্ক আর নেই। যদিও ব্রতীন আর অনিশা— দুজনেরই রাজদীপের সঙ্গে এখনো সম্পর্ক আছে। কিন্তু ব্রতীনের মুখে অনিশা দ্বিতীয় বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শুনে রাজদীপের মন রুক্ষ ও এলোমেলো হয়ে যায়।

"যেখানে এক অবরুদ্ধ স্রোতের মতো অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যে থমকে আছে বহুদূর অভিমান। তার ছোট বুদ্ধি দিয়ে পরমহংস বুঝতে পারে রাজুর এই অভিমান যতই সত্য ও বাস্তব হোক, দাম পাবে না তত; তারপর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে জমা হবে স্মৃতিতে। মনে পড়বে, মনে পড়াবে।"[৬৩]

'ওঠা কিংবা নামা' উপন্যাসে নীলা ও অসীমের দশ বছরের দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙন ধরেছে অসীমের সন্দেহে। নীলা ও অসীম দুজনেই অফিসে চাকরি করে। অসীম চাইতো নীলা চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঘরেই থাকুক। কিন্তু নীলার উচ্চাশা অন্য। অফিসের বসের সঙ্গে তার ভাব হয়ে গেছে। অনেক টাকা বেতন বেড়েছে তার, এখন সে ওপরে ওঠার মুখে। তার কাছে টাকা মানে আরো সুখ, আরো স্বাচ্ছন্দ্য। ওপরে ওঠার সিঁড়ির মাঝামাঝি তাকে দিশেহারা করতে চায় অসীম। তার ওঠা মানে যে অসীমেরও ওঠা তা অসীম বুঝতো না। কিন্তু নীলাও নাছোড়বান্দা। সে ভেবেছিল সময় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। অসীমের স্বভাব একগুঁয়েমি; নিজের ভাবনার বাইরে সে এক চুলও এগোয় না। কেউ বোঝালেও বোঝে না। শ্যামলেন্দুর সঙ্গে নীলার মেলামেশাটা সে ভালো চোখে দেখেনি। দিন যতো গেছে সন্দেহ ততোই বেড়েছে। এদিকে শ্যামলেন্দুর সঙ্গে না মিশলে নীলার যে পদোন্নতি হবে না সেটা নীলা ভালো করেই জানে। বেসরকারি অফিসে এটাই সত্য। বসকে খুশি করতে হয় নীলাকে। যে কোনোদিন মদ ছোঁয়নি, সে বসের সঙ্গে বসে বিয়ার খায়, পার্টিতে যায়, ধীরে ধীরে তাদের সম্পর্ক গভীর হতে থাকে। নীলা এই অবস্থা থেকে আর বেরোতে পারে না। এদিকে অসীমের সঙ্গে নীলার কোনো কথাবার্তা নেই বললেই চলে। একই ফ্ল্যাটে থাকলেও অসীম নিজের মতো চলে। তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক যে ধীরে ধীরে ভেঙে যাচ্ছে নীলা বুঝতে পারে। সাত বছরের ছোট্ট মেয়ে টিনার কথা ভেবে নীলা অসহায় বোধ করে।

"তখনই ভয়টা চেপে আসে। অসীম আর শ্যামলেন্দু নিজেদের নিয়ে আলাদা— সে পা রেখেছে দু নৌকায়। ঢেউয়ে সমতা নেই কোনও। এর মধ্যে যে কোনও একটি টাল খেলেই ডুববে।"[৬৪]

দুই পুরুষের মাঝখানে নীলা মানসিক দ্বন্দ্বে পড়ে। অসীমের সন্দেহ তাকে মানসিক যন্ত্রণা দিয়েছে। সে বিবাহিত বলে অসীমকে ছাড়তেও পারে না। অফিসকর্মী রঞ্জনার ইঙ্গিতে শ্যামলেন্দুকে নিয়ে টানাপোড়েনে তার মনকে আরো জ্বালিয়ে দিয়েছে। নীলা মনে মনে স্থির

করে তিনজনের মধ্যে একজনকে সরে যেতে হবে। নিজেকে তাদের একজন ভাবে। মনের ভিতর ক্রমাগত শূন্যতা অনুভব করে। শেষে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়ে—

> "গাড়ির সিটে ভারী ঘাড়টা যতটা সম্ভব এলিয়ে দিয়ে নীলা ভাবল, এই যাওয়াটার ভুল নেই কোনও। উচ্চাশা তাকে অনেক দিয়েছে, নিয়েওছে অনেক! হয়তো এবার সে আরও এক ধাপ উঠবে। হয়তো নামবে। সে জানে না।"[৬৫]

তথ্যসূত্র :

১. রায়, প্রদীপ্ত (সম্পাদিত) : প্রিয়দর্শিনী, দিব্যেন্দু পালিত, বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, জানুয়ারি - মার্চ ২০০৩, পৃ. ১৬

২. পালিত, দিব্যেন্দু : সিন্ধু বারোয়াঁ, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৬

৩. তদেব : পৃ. ৬০

৪. পালিত, দিব্যেন্দু : সেদিন চৈত্রমাস, বসু চৌধুরী প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬১, পৃ. ৬২

৫. পালিত, দিব্যেন্দু : ভেবেছিলাম, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৭৯

৬. পালিত, দিব্যেন্দু : কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান, সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯১, পৃ. ১০৭

৭. পালিত, দিব্যেন্দু : ভেবেছিলাম, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৮৩

৮. পালিত, দিব্যেন্দু : কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান, সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯১, পৃ. ১০৭

৯. পালিত, দিব্যেন্দু : ভেবেছিলাম, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১৯১

১০. তদেব : পৃ. ২২৭

১১. পালিত, দিব্যেন্দু : মধ্যরাত, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ২৩২

১২. পালিত, দিব্যেন্দু : প্রণয়চিহ্ন, প্রথম পাঁচটি উপন্যাস, প্রতিভাস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৫, বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৩৫৯

১৩. তদেব : পৃ. ৩৭৯

১৪. তদেব : পৃ. ৩৬৮

১৫. পালিত, দিব্যেন্দু : সন্ধিক্ষণ, দশটি উপন্যাস (১), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠমুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ১১

১৬. তদেব : পৃ. ১৬

১৭. পালিত, দিব্যেন্দু : বৃষ্টির পরে, দশটি উপন্যাস (১), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ২৫৬

১৮. তদেব : পৃ. ২৫৫

১৯. পালিত, দিব্যেন্দু : একা, দশটি উপন্যাস (১), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ৩৯৪

২০. তদেব : পৃ. ৪১৩

২১. তদেব : পৃ. ৪২১

২২. তদেব : পৃ. ৪৪১

২৩. তদেব : পৃ. ৪৫৭

২৪. পালিত, দিব্যেন্দু : সবুজগন্ধ, দশটি উপন্যাস (১), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ৬৫৭

২৫. তদেব : পৃ. ৬৭৮

২৬. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম চন্দ্র : কমলাকান্তের দপ্তর, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ষষ্ঠদশ মুদ্রণ, ১৪১৭, পৃ. ৬৮

২৭. পালিত, দিব্যেন্দু : কিছু স্মৃতি, দুঃখবোধ, কিছু অপমান, সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯১, পৃ. ১০৬

২৮. পালিত, দিব্যেন্দু : সম্পর্ক, দশটি উপন্যাস (১), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ৭৫

২৯. তদেব : পৃ. ৭৫

৩০. রায়, বব (সম্পাদিত) : আমার সময়, কলকাতা, ২য় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃ. ২৫

৩১. পালিত, দিব্যেন্দু : বিনিদ্র, দশটি উপন্যাস (১), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ২৮১

৩২. পালিত, দিব্যেন্দু : আমরা, দশটি উপন্যাস (১), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ১৭৯

৩৩. পালিত, দিব্যেন্দু : উড়োচিঠি, দশটি উপন্যাস (১), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫ পৃ. ৪৬৮

৩৪. তদেব : পৃ. ৪৬৮

৩৫. তদেব : পৃ. ৪৬৮

৩৬. তদেব : পৃ. ৪৭৩

৩৭. পালিত, দিব্যেন্দু : সহযোদ্ধা, দশটি উপন্যাস (২), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২, পৃ. ৬৭

৩৮. ভৌমিক, তাপস (সম্পাদিত) : কোরক সাহিত্য পত্রিকা, কলকাতা, শারদীয়, ১৪০০, পৃ. ৫১

৩৯. পালিত, দিব্যেন্দু : গৃহবন্দী, দশটি উপন্যাস (২), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২, পৃ. ৭১৪

৪০. তদেব : পৃ. ৭১৫

৪১. পালিত, দিব্যেন্দু : মাইন নদীর জল, কলকাতা, প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশ-মে ১৯৮৮, পৃ. ৪৪

৪২. তদেব : পৃ. ৪৫

৪৩. পালিত, দিব্যেন্দু : সোনালী জীবন, দশটি উপন্যাস (২), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২, পৃ. ২৫৪

৪৪. তদেব : পৃ. ২৫৪

৪৫. পালিত, দিব্যেন্দু : ঢেউ, দশটি উপন্যাস (১), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন ২০১৫, পৃ. ২৭৫

৪৬. তদেব : পৃ. ২৮২

৪৭. পালিত, দিব্যেন্দু : অন্তর্ধান, দশটি উপন্যাস (২), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, আগস্ট ২০১২, পৃ. ৫২৫

৪৮. তদেব : পৃ. ৫১৮

৪৯. পালিত, দিব্যেন্দু : অনুসরণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ১৯৯৮, পৃ. ৪৫

৫০. তদেব : পৃ. ৭২

৫১. রায়, প্রদীপ্ত (সম্পাদিত) : প্রিয়দর্শিনী, দিব্যেন্দু পালিত, বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৩, পৃ. ১৪৩

৫২. পালিত, দিব্যেন্দু : মৌনমুখর, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ১০৭

৫৩. তদেব : পৃ. ১১০

৫৪. পালিত, দিব্যেন্দু : সংঘাত, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৪১

৫৫. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার : লেখকের মুখোমুখি, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ. ৪৬৯

৫৬. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার : পঞ্চাশের দশকের কথাকার, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯, পৃ. ৩১৬

৫৭. পালিত, দিব্যেন্দু : অচেনা আবেগ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫, ভূমিকা, পৃ. ০১

৫৮. তদেব : পৃ. ৩২

৫৯. তদেব : পৃ. ৯৪

৬০. পালিত, দিব্যেন্দু : মাত্র কয়েকদিন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ. ৯৬

৬১. পালিত, দিব্যেন্দু : সেকেণ্ড হনিমুন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ৩৬

৬২. পালিত, দিব্যেন্দু : যখন বৃষ্টি, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০১২, পৃ. ৬৮

৬৩. পালিত, দিব্যেন্দু : বহুদূর অভিমান, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০২, পৃ. ৭৩

৬৪. পালিত, দিব্যেন্দু : ওঠা কিংবা নামা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৫, পৃ. ১০৮

৬৫. তদেব : পৃ. ১৫০